চিতা

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সাহিত্য প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৮
প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৭২
প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ঃ নিতাই দাস
মুদ্রণ ঃ তনুশ্রী প্রিন্টার্স ঃ ২১বি রাধানাথ বোস লেন ঃ কলকাতা-৭০০ ০০৬

এক

জয়তী আমার বান্ধবী। অন্ততঃ কালকের আগে পর্যান্ত এটাই সত্য ছিল। কাছে আসতাম, আদর আবেগ অনুরণন এবং এক ঘেয়েমিতে ছিটকে যেতাম দূরে। সম্পর্কের প্রথম শর্ত্ত ছিল— প্রাত্যহিকতার ক্লিশে অভ্যাসযাপনে আমরা মরিচা হবনা। আবিষ্কার করব প্রত্যহ নিজেদেরই। কাছে আসবার আর্তি হবে গভীর, আসতে না পারার সংকট থাকবে গভীরতম। আর এরই সাথে পাল্লা দিয়ে তাড়া হবে দূরে ছিটকে যাবার অবধারিত প্রবণতা।

ব্যাপারটা অবশ্যই গোলমেলে। এরকম কোন সম্পর্ক আদৌ তৈরী হয় কিনা সেটিও বিতর্কিত। তবুও চলছিল। বাউন্ডুলে অস্থির-তায় এবং জীবিকার অনিশ্চয়তায় মাদকময় রাত্রির খরযাপনে মাঝে-মধ্যেই বঙ্কিম হয়ে উঠছিল চিবুক। তাপে অনুতাপে শান্তিনিকে-তনের আলোছায়ায় গোপন যে একটা নদী জেগে উঠবে আমার ধারণায় অন্ততঃ সেটা ছিলনা। জয়তী কলাভবনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কৃতীছাত্রি। চিন্তনে মানসিকতায় এবং ব্যবহারিক জীবনেও এক প্রতিশ্রুত শিল্পী।

মাস চারেক আগের দেখা হওয়ার সময় ও নতুন সেশন্ চালু হয়েছে। হস্টেলের ঘর বদলেছে এবং গ্লাস-পেইন্টিংএ সার্থক হয়ে ওঠবার স্বপ্ন দেখছে। ছবি তৈরীর চিন্তাভাবনায় একটা লজিক্যাল মোচড় নিয়েছে। বন্ধু হিসেবে এর বেশি বলতে গেলে ছবি আঁকিয়েরা হয়ত ইজেল্ নিয়ে তাড়া করবে। বরং সে সব থাকুক। কালকের এক আকস্মিক প্রশ্নের আঁচড়ে ক্ষত কতটা গভীর হয়ে গ্যাছে—বোলপুর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সেটাই ভাবছিলাম। জয়তীর শিল্পী ব্যক্তিত্ব সাধারণের থেকে ওকে এতটাই আলাদা করেছে যাকে প্রায়শই আবিষ্কার করতে হয়। তথাপি কালকের জয়তী এতটা বদলে গেল কিভাবে। একেবারেই চারপাশের অগণিত রুমা ঝুমা বিন্দু কোকিলাদের মত।

কালকের সারাটা দুপুর দুরন্ত আদরের মধ্যে বারবার গুঙিয়ে উঠেছে 'পারছি না **অঙ্কুর** আমি পারছি না'। তখনও বুঝিনি ওর জখমটা কোথায়। চেষ্টা করেছি নিজেকে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে আবারও ততোধিক ক্ষুধার্ত। অমোঘ আছাড়ে আমরা ছিঁড়ে গেছি কোষ মজ্জা প্রতিটি নিঃশ্বাসে। পরিচিত এক বন্ধুর পরিত্যক্ত বাড়ী আমাদের মগ্ন সাক্ষাতের গুপ্তভূমি। এ এক পুরোনো খেলা। এ এক রক্তাক্ত সাঁতার। অবগাহন।

এই মেশামিশি কিছুটা প্রথাবহির্ভূত। তবুও কাঙ্খিত। অন্ততঃ পারস্পরিক ভার বহনে আমরা কেউ অপরিহার্য হয়ে উঠবনা - সেই প্রতিশ্রুতিতেই আমরা ঋদ্ধ। কিন্তু হস্টেলে ফেরবার আগে কাল কেন হঠাৎই জিজ্ঞাসা করল 'আবার কবে আসবে? প্রশ্নটা তিন বছরের সম্পর্কে প্রথম শুনলাম। শুধু প্রশ্নই নয়, একটা উদ্বেগ। জয়তী চাইছে পরবর্তী সাক্ষাতের আগে আমরা যেন ভাববার সুযোগ পাই ঠিক এভাবে একটা সম্পর্ক বয়ে বেড়াবার মত মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের আছে কিনা! অর্থাৎ একটা ক্লান্তিতে হয়ত সে কিছুটা বিপর্যস্ত। প্রচলিত এক প্রথানুগ রাস্তায় একটা চুক্তি চাইছে বৃত্ত গড়বার।

জয়তী ছবি আঁকতে চায়, চাইছে শিল্পী হতে। হয়ে ওঠবার পথটা নির্মম একাকীত্বের, আপোষহীন কষ্টযাত্রার। ছবি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আসক্তি ছোটবার পথটা এলোমেলো করে দিতে পারে। যৌথচারিতায় সুবিধা অবশ্যই কিছু আছে, পাশাপাশি নিকটবর্তী মানুষের প্রতি রয়ে গ্যাছে দায়বদ্ধতাও। পারস্পরিক মতামতকে গুরুত্ব দিতেদিতে হয়ত ভারী হয়ে উঠবে স্বতন্ত্র কব্জী, তুলি হয়ে উঠতে পারে সংযত। বিষয় হয়ে উঠতে পারে নিয়ন্ত্রিত। এ সব পারেই। ব্যাপারটি এতই সুক্ষ্ম— সৃষ্টিশীল ব্যক্তি ছাড়া দ্বন্দটি বোঝানো এক দুরূহ গোলযোগ। জয়তী অবশ্যই বোঝে। হয়ত কাল রাত্রিটা পেরিয়ে এসে নিজেরই ভিখিরিপনায় নিজেকে ধিক্কৃত করেছে বারবার। প্রসঙ্গত, যে শিল্পী নিজের স্টাইল আবিষ্কার

কোরে দাঁড়িয়ে গ্যাছে অভিব্যক্তির বিশেষ এক স্তরে তার কাছে হয়ত এই যৌথ জীবনের আকাঙখা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু যে প্রস্তুতি নিচ্ছে শিল্পী হয়ে ওঠবার তার কাছে ছন্নছাড়া আকস্মিকতা যতটা কাঙ্খিত, নোঙরের মোহকে কিছুতেই ততটা প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। অন্ততঃ জয়তী আমার কাছে এই দ্বিতীয় গোত্রের যার উদ্দেশে আমার স্বতঃস্ফূর্ত পংক্তিটি ছিল 'তুমি তো অরণ্য নও/আরও কিছু বেশি / আরও বেশি অপরূপ / অনন্তের গো-চারণ ভূমি'। — আপাতত থামতে হচ্ছে কারণ লেখাটি জয়তী সম্পর্কিত নয়। লেখাটির নায়ক প্রলয় মজুমদার। আর সেইখানে পেঁছিতেই জয়তী বিষয়ক এই ভূমিকা।

দুই

বেলা দুটোর বাসস্ট্যান্ড। বাঁকুড়ার বাস ধরতে এসে কখন যেন জড়িয়ে গেছি নিজস্ব কুয়াশায়। যেন এখনও সেই ঘর, সেই নৈঃশব্দ সেই দুরন্ত ভাসানে ক্রমাগত উড়িয়ে দিচ্ছি ঢেউ। দেখা হবার ব্যবধান এবার দীর্ঘ হবে। কিছুটা আড়ালে দাঁড়িয়েই জয়তীকে বাড়তে দিতে হবে জয়তীর মত। দাম্পত্য ছাড়াও বন্ধুত্বের অন্য একটা দাবি থাকে পারস্পারিক নির্মাণে সহযোগিতার। পালিয়ে গিয়ে নয় বরং দায়বদ্ধতায় প্রতীক্ষাকেই সীমায়িত করা যায় ব্যক্তিগত কষ্টের মধ্যে।

সিগারেট অনেকটা পুড়েছে। কানের পাশে হঠাৎই এক উচ্চারণের কম্পনে আবেশ ছিঁড়ে যায়, লম্বা ছাই ঝরে পড়ে মাটিতে। 'আগুনটা দেবেন'? হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব। আগুনতো দিতেই চাই। কে আপনি, পুড়ে যাবেননা তো! পারবেন তো পুত এই অগ্নিকে ধারণ করতে, পরিচর্যা করতে! পারবেন তো উজ্জ্বল শিখায় তাকে বহন করতে কোন সুদূর যাত্রায়! — ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি পঞ্চাশ অতিক্রান্ত ঋজু এক পুরুষ। ৮০ শতাংশ চুল সাদা। কপালে ও দু-চোখের পাশে স্পষ্ট রেখাগুলোয় স্থির জেদি পিছু না-হটা এক পৌরুষের

স্বাক্ষর। চিবুকে চোখে, অনুচ্চার তাজা ঠোঁট দুটোয় স্পষ্ট এক স্থাপত্য। অত্যন্ত মার্জিত উচ্চারণে পুনর্বার অনুরোধ 'আগুনটা প্লীজ'। পকেট হাতরে ম্যাচটা তুলে দিলাম। নখ স্পর্শ করল আঙুল। কি ভীষণ স্থবির। যেন দীর্ঘদিন স্পর্শ করেনি মসৃণ কিছু। ম্যাচটা থাবায় নিয়ে মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক। স্বচ্ছ পাতলা প্রাজ্ঞ হাসি। দূরকে দেখতে পারার এক অহংকার সারাটা আভিজাত্যে। সিগারেট না ধরিয়েই আবার প্রশ্ন করলেন 'কোথায় যাবেন'? কোথাওতো যেতেই হবে! অন্ততঃ যাবার জন্যই তো বেড়িয়েছি, যাবারই জন্য এত আয়োজন কোলাহল ব্যস্ততা। যাওয়া। উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম 'আপনি কোথায় যাবেন'? সহজ উত্তরে বললেন 'বাঁকুড়া'।

—আমিও বাঁকুড়া যাব। বাস কখন আসবে?

—এক্ষুনি এসে যাবে। – বেড়াতে যাবেন নাকি কাজে!

—দুটোই। একজন বন্ধু আছে, দেখা করাও হবে পাঁচমুড়াতেও একবার ঘুরে আসব। পোড়ামাটির ঘোড়া কেনবার বহুদিনের শখ।

এতক্ষণে সিগারেট ধরিয়ে ম্যাচটা ফেরত দিয়ে ভদ্রলোক বললেন 'ভালই হল, একসাথে যাওয়া যাবে'। প্রস্তাবটি পছন্দ না-হলেও মুখের ওপর স্পষ্ট কিছু বলতে পারলাম না। কারণটি অবশ্যই ওই মুখটার অসাধারণ রেখাবিন্যাস। জয়তী থাকলে নিশ্চয়ই খচাখচ কটা স্কেচ করে নিত। ভীড়ের শহরে এধরণের মুখ প্রকৃত দুষ্প্রাপ্য। ভদ্রলোক আলটপকাই নিজের নামটাও শুনিয়ে দিলেন 'প্রলয় মজুমদার'। কিছুক্ষণ থেমে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন 'আপনি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতন থেকে আসছেন'!

—কি করে বুঝলেন! ভদ্রলোক একরকম চমকে দিয়েই বলতে শুরু করলেন—'আপনার বয়স, আপনার মগ্নতা, আপনার ঔদাসিন্য দেখে'। নিজের সম্পর্কে এমন মূল্যায়ণ কোন অপরিচিতের কন্ঠে ধ্বনিত হলে, সে ব্যক্তিটি বোধহয় আর অপরি-

চিত থাকে না। নিরাসক্ত উচ্চারণে তাকে উপেক্ষা করা কোন ধূর্ত মানুষের পক্ষেও বোধহয় সম্ভব নয়। জানিনা সম্ভব কিনা, আমি পারিনি। বিস্ময় এবং বিপন্নতায় আমার পরিচিতের বৃত্তে আরও একটি মুখ সংযোজিত হয়ে গেল, স্বল্পকালীন পৃথিবীবাসে যে ব্যক্তিটিকে জানতে এবং বুঝতে খরচ করে ফেলতে হবে কিছুটা সময়। সুযোগও এসে গেল তক্ষুণি। ভদ্রলোক নিজেই উপযাচক হয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন, 'চলুন, আজ রাতটা আমার ওখানেই কাটিয়ে যাবেন'। কথাটা শেষ হবার সাথেই তীক্ষ্ণ বাঁশি হাঁকিয়ে রৈরৈ ক'রে ছুটে এলো বাস। বাঁকুড়ার বাস। ওঠা হল, দুটি সিটও জুটল, পাশাপাশি। অবশেষে সেই ভূমিখন্ডকে, জয়তীকে, শান্তি-নিকেতন পিছনে ফেলে রেখে চাকা দৌড়ে চলল যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে।

তিন.

আমি এবং প্রলয় মজুমদার খুব কাছাকাছি আছি। কাছাকাছি! বস্তুতঃ এই শব্দটি খুবই আপেক্ষিক এবং আক্ষরিক অর্থেই আপে-ক্ষিক। স্নায়ু ধমনী কোষে চামড়ায় ঢাকা দুটি কঙ্কাল হয়ত কিছুটা নিকটবর্তী কিন্তু দুটো মানুষ কিভাবে এত কাছাকাছি পাশাপাশি থাকবে! কিভাবে! দুটো মনোভূমির কেন্দ্রবিন্দু যেমন আলাদা— দুজনার স্বপ্ন ও সার্থকতা, সংগ্রাম স্বাধীনতা এমনকি দুঃস্বপ্ন ও ব্যর্থতার সুতোয় লাট খাওয়া দুটো বৃত্তও তো একেবারেই পৃথক। এবং স্বাভাবিকভাবেই দুজনার দূরত্বও এত বেশি ব্যাপক, মধ্যবর্তী নৈঃশব্দে কিছুটা তার আভাস আছে।

স্তব্ধতা ভাঙলাম আমি। প্রশ্ন করলাম 'আমার শান্তিনিকেতন থেকে ফেরা সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে! আর বাড়ীতেই বা হঠাৎ আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন কেন'! ভদ্রলোক এভাবেই নৈঃশব্দ ভাঙবার যেন প্রত্যাশায় ছিলেন। আমার প্রশ্নটি যে নিছকই প্রশ্ন সেটা আমিও জানি। তবু কথা বলবার তাড়নায় আমায় বলতে হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমার কাছে এক জিজ্ঞাসা। যাই হোক প্রলয়-বাবু প্রথম উত্তরটি দিলেন সন্তর্পণে এবং নিরুত্তাপ 'অভিজ্ঞতায়'!

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি দেবার আগে কিছুটা নীরবতা, কিছুক্ষণ বাসের জানলা দিয়ে ঝাপ্‌সা দূরে তাকিয়ে থাকা এবং কিছুটা অন্তর্গত নিবিড়তায় স্থির—

—আসলে আমারও যে একটা অতীত থাকতে পারে নিশ্চয়ই তাকে অস্বীকার করেন না। আমারও একটা তরুণ বয়স ছিল আর সেই তারুণ্যে ছিল আপনারই মতো কিছুটা উদাসীনতা, কিছুটা ঝুঁকি, কিছুটা বেপরোয়া জীবন যাপন।

—এটা আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটির সঠিক উত্তর বোধহয় হলনা। কারণ এগুলো সবই আপনার নষ্টালজিয়া। এর সাথে আমার মত একজন অপরিচিতকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক্য কি!

—সম্পর্ক্য!!

কথাটা বলেই থামলেন। চোখদুটো বাসের জানালা দিয়ে আবারও ছুঁড়ে দিলেন বীরভূমের লালমাটির মাঠের এধারে ওধারে। আকাশ জুড়ে ঝুলে থাকা, রোদ্রে উজ্জ্বল সাদা মেঘগুলোর ফাঁক ফোকড়ে যে অনন্ত গহ্বর, হয়ত সেখান থেকে কিছু উদ্ধার করবার আকুলতায় কিছুটা ক্লান্ত কিছুটা আত্মগত উচ্চারণে বাকি কথাগুলো ছড়িয়ে দিলেন নীল বিস্তৃত ওই আকাশের অন্তহীনতায়—

— আপনাকে হঠাৎই আমার খুব পরিচিত মনে হল। মনে হল আমি আপনাকে ততটাই চিনি যতটা নিজেকে চিনেছি।

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগলেও একটু যেন নড়ে উঠলাম। উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

—আপনি কখনও ভুল করেছেন?

—জীবন্ত মানুষ ভুল করেই।

—না, আমি জিজ্ঞেস করছি এমন কোন ভুল যার প্রায়শ্চিত্ত করতে মানুষকে একা হয়ে যেতে হয়! একদম একা! একা থাকাটা খুব যন্ত্রণার জানেন!

মধ্যরাতের খোলা ছাদে দাঁড়ালে গ্রাম বাংলায় প্রায়শই যে শব্দ, নৈঃশব্দের বুদবুদের মত ভেসে ওঠে, শুকনো পাতার সেই আলুলায়িত

আওয়াজই যেন প্রলয় মজুমদারের আত্মমগ্ন স্বীকারোক্তি। অগোচরে আমাকেও বাধ্য করছে এই মানুষটির জন্য পৃথিবীর কিছু পৃষ্ঠা, ধ্বনি আর অক্ষরে ভরিয়ে তুলতে।

ধৈর্য্যের অবশ্যই একটা সীমা আছে এবং থাকাটাই উচিত। নতুবা অনেক ভুলভাল ক্রিয়া ও কর্মকুশলতার ব্যস্ততায় যে একঘেয়েমি—বিরক্ত লাগত গ্রহটারই অস্তিত্ব। যে মানুষটাকে এখনও আমার নাম পর্য্যন্ত জানানো হয়নি, এই ভীষণ ভারী ভারী দার্শনিক কথাবার্ত্তা তার মুখ থেকে শুনতে শুনতে আমি কেমন জেনারো হয়ে উঠছি। ওনার প্রশ্ন কি শুধুই প্রশ্ন! বাসস্ট্যান্ডে এতক্ষণ আমিও কি জড়িয়ে ছিলাম না এইসব আত্মসমীক্ষায়! ভদ্রলোক যেন দুহাতে উপড়ে তুলছেন আমারই অবচেতন। ভুল, প্রায়শ্চিত্ত, একাকীত্ব—এইসব শব্দবন্ধের অবিরল খোঁচায় আমিও বিদ্ধপ্রায় কেমন ছটফট করছি ডানায়। ওনাকে আমারও আর অপরিচিত মনে হচ্ছেনা। পরের কথা গুলো কেমন হৈ চৈ করে ঢুকে পড়ল কানে।

—একটা ব্যক্তিগত কথা জানতে ইচ্ছা করছে। অনুমতি দেবেন!

—কি কথা!

—আপনার জীবিকা নিশ্চয়ই খুব অনিশ্চিত?

—হ্যাঁ, কথাটা সত্য। কিন্তু আপনি কিভাবে বুঝলেন?

—শিল্পীর চোখ দিয়ে। বোধহয় তাও নয়—সম্ভবতঃ আপনার মধ্যে আমি দেখছি এক আত্ম-প্রতিফলন। অনিশ্চিত কোন জীবিকায় কোনক্রমে ঝুলিয়ে রাখা একটা অস্তিত্ব। আর সেই অস্তিত্বের মধ্যে সংগোপনে শিকড় নামিয়ে দেওয়া দায়বদ্ধতা নামক এক সংক্রমণ।

ভুল, ভুল—ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলি 'মিথ্যে, মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে। তুমি যা ভাবছ সব ভুল অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক। আমি জীবন্ত ভীষণ রকম জীবন্ত বর্ষার মেঘের মত, হেমন্তের মাঠের মত, শ্মশানের উড়ন্ত চিতার মত খুশী, আর্দ্র, মোলায়েম'। কিন্তু পারিনা, বলতে পারিনা। অসহায় ভাবে নত হয়ে যাই ভদ্রলোকের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলনের সামনে। ওনাকে এর পরেও বলতে

দেওয়া আমার কাছে মৃত্যুর মত। কারণ উনি আমাকে পড়ে ফেলেছেন। আর এই পড়ে ফেলবার অর্থ আমার অহংকারের মৃত্যু। মৃত্যু একটা স্বাতন্ত্র্যের। বিশেষ একশ্রেণীর মানুষের তালিকায় আমিও এক খুদে গিনিপিগ। সূত্র মিলিয়ে আমাকে বুঝে নিচ্ছেন এই ভদ্রলোক। তবু শুনে যেতে হবে। সত্যকে অস্বীকার করবার মধ্যে আমি যে বেঁচে আছি সেটা প্রমাণিত হয় না। বরং আমারও উচিত বিশেষ কোন সূত্র ধরে এই ভদ্রলোককে গিনিপিগ বানানো। কিন্তু কিভাবে! কারণ ভদ্রলোককে ঘিরে আমার মধ্যে ক্রমশই একটা রহস্যের জামদানি বুনে উঠছে। বেড়ে উঠছে জেদ। ছিঁড়তে হবে রহস্যের পর্দা। পালাব না। ররং আজকের রাতটা এর সাথে কাটিয়ে বোঝাবুঝিটা সেরে ফেলতে হবে। আর সেই চেষ্টাতেই অভিসন্ধিমূলক জিজ্ঞাসায় ওনাকে ব্যস্ত রাখবার সিদ্ধান্ত নিলাম। নিজেকে আড়াল করবার প্রচলিত উপায়টিই হচ্ছে অন্যকে উন্মোচিত করা।

—আমাকে প্রায় অনেকটাই বুঝেছেন আপনি। আপনাকেও তো আমার কিছুটা জানা দরকার!

—বলুন কি জানতে চাইছেন?

—আপনার সেই অতীত, যাকে এর মধ্যেই খুইয়ে এসেছেন।

—সে তো অনেক দীর্ঘ। বাসে বসে বলা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ সবটা শোনানো এখন আর সম্ভব নয়।

—সবটা না হোক, কিছুতো শোনাই যেতে পারে! অন্ততঃ আপনার ভুলগুলো, প্রায়শ্চিত্ত, যন্ত্রণা, একাকীত্ব— এই সব।

—আপনি খুব সেন্সিটিভ তো। আমার কথা দিয়েই আমাকে বিদ্ধ করে ফেললেন। জানতে যখন চাইছেনই, জীবনের কয়েকটা বাঁকের মুখে আপনাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। বাকিটা আপনার অচেনাকে দেখবার যোগ্যতা এবং কিছুটা অভিজ্ঞতা। বোধহয় আমার ক্যান্‌ভাসটা তেমন কিউরিও কিছু নয়। সহজেই রঙের পোঁচে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবেন অসমাপ্ত ছবি।

—ধন্যবাদ, সেটুকুই হোক। বাঁকে দাঁড়িয়ে আর কিছু না হোক নদীর প্রবাহটা তো বোঝাই যায়।

—তার আগে আমার আরও একটা ধারণাকে যাচাই করে নিই। আপনি কি কবিতা লেখেন?

—কি ভাবে বুঝলেন!

—আসলে বাসস্ট্যান্ডে আপনাকে অতটা অ্যাবজরবড থাকতে দেখে মনে হচ্ছিল, কবিতাটা আপনাদেরই লেখা উচিৎ।

—কিন্তু হঠাৎ কবিতারই জন্য আমায় বেছে নিলেন কেন? ওটাতো ছবি আঁকিয়েও ভাবা যেতে পারত!

—ভাবিনি যে, তা নয়। যে কোন ক্রিয়েটিভ ফিল্ডেই আপনাদের মত তরুণদের ভাবতে ভালো লাগে।

—না না, আমি জানতে চাইছি আমায় কেন হঠাৎ কবি ভাবতেই ইচ্ছে করল?

—উত্তরটা আমায় ভেবেই দিতে হবে। বোধহয় ম্যাচেজ্‌টা আপনার হাত থেকে নেবার আগে আমার মধ্যে একটা দোটানা ছিল! ভাবছিলাম আপনি হয়ত ফোটোগ্রাফি কিম্বা ..... । কিন্তু ম্যাচ্‌টা নেবার সময় আপনার নখের স্পর্শে মনে হল ছবি আঁকবার কঠিনতা এ থাবায় নেই।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঠিক ওই স্পর্শটুকুই কখনও কখনও একজন মানুষের গোপন সংবেদনটুকু বুঝিয়ে দিতে হয়ত সাহায্য করে।

—থাকুক এসব। আমার কথা অনেক হল। এবার আপনার কথা কিছু বলুন।

—খুবই সাধারণ। আর্ট কলেজের ফাইন্ আর্টসের স্নাতক শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম এম. ফাইন্ করতে। পূর্ণিমার সঙ্গে পরিচয়। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব। শমীক— অর্থাৎ আমার এক এঞ্জিনীয়র বন্ধুর সঙ্গে পূর্ণিমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া, ছবি আঁকা, পড়া শেষ কোরে রং-তুলি ঘাড়ে ব্যাপক পরিভ্রমণ। মাঝে মাঝে পূর্ণিমার আমন্ত্রণ, ঘনিষ্ঠতা তুঙ্গে এবং আকস্মিক শমীককে পূর্ণির স্বামীত্বে বরণ। ট্র্যাজেডির শুরু। চিঠিতে তাদের সংসার, সন্তানের আবির্ভাব ইত্যাদির ধারা বিবরণ এবং পরবর্তী ফেজ্‌টাই একটি ব্যতিক্রম।

—কি রকম ?

—হঠাৎ দিল্লী থেকে শমীকের একটি তাৎপর্যপূর্ণ চিঠি এলো একদিন। চিঠিতে অনুরোধ ছিল একবার বাঁকুড়ায় গিয়ে তার সাথে দেখা করবার। ব্যাস—

—তারপর !

—তারপর ?

বাসের জানলা দিয়ে সূর্য ডুবে যাওয়া অরণ্যের ফাঁকে প্রলয়বাবু মুখটাকে আড়াল করলেন। চোখদুটোকে আর দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছিনা ভদ্রলোকের দৃষ্টি এখন পৃথিবীর কোন্ দ্রাঘিমার শস্যময় ক্ষেত উঁড়িয়ে গোপন কোন্ অতলে বন্দ হয়ে আছে ! কিছু পরেই উচ্চারণ কিছুটা অন্যমনস্ক হলেও, কন্ঠস্বরের অনুচ্চাকিত গম্ভীরতায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল চোখ থেকে গড়িয়ে নামছে ক্লান্তির কয়েকফোঁটা নোনতা পরমায়ু। জানা গেল বাঁকুড়ার কোন এক স্কুলে যদিও এখন তিনি শিক্ষকতা করছেন তবু ছবি একদিন আঁকবেনই। শুধু শমীকের ফিরে আসবার জন্যই যেটুকু প্রতীক্ষা। কথাগুলোয় কেমন যেন ঘন হয়ে উঠল নতুন এক রহস্য। পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আগেই উনি এক পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি কখনও কাউকে কথা দিয়েছেন ? যেমন ধরুন কথা রাখবার মত কোন কথা' ! জিজ্ঞাসার তীব্রতায় প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হলেও পরবর্তীতে স্মৃতি ঘাঁটতে শুরু করেছি। হয়ত আমার মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে যে বিহ্বলতা, সেটুকু অনুমান করে উনি নিজেই বলতে শুরু করলেন 'আমি কিন্তু কথা দিয়েছি এবং কথা রাখবার মত কথা'। দৃঢ়তম এই বাক্যটির শেষে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু মৌনতার প্রয়োজন হয় এবং এই মৌন থাকবার অধিকার শিল্পী হিসেবেই তার জন্মগত। সুতরাং এখন আমার প্রথম কর্তব্য, সেই অধিকারটুকুর মধ্যেই কিছুক্ষণ তাকে পুড়তে দেওয়া। বাসের কোলাহলের মধ্যে আমি কিছুটা বিশ্রাম খুঁজতে চাইলেও জয়তীর মুখটা বারবার ফিরে আসছে আচ্ছন্নতায়। এবং একসময় জয়তীর মুখের মধ্যেই যেন খুঁজে চলেছি অন্য এক পূর্ণিমাকে। ক্রমশই স্পষ্ট করে তুলছিলাম কোন এক

শমীকেরও রূপ-অবয়ব। আর পাশে বসা মানুষটিকে কল্পনায় জুড়ে গেঁথে তরুণ এক শিল্পীকে যেন উদ্ধত পায়ে হেঁটে যেতে দেখছি পাহাড় সমুদ্র অরণ্য ছুঁয়ে ছুঁয়ে নতুন সব শহরে। নতুন সব আভিজাত্য ফাটিয়ে বিরাট বিরাট ক্যান্‌ভাসের সামনে রং আর তুলির আঁচড়ে নেচে উঠছে চিরায়ত এক আগুনের ফুল্‌কি।— বাইরে এর মধ্যেই কখন নিবীড় হয়ে এসেছে অন্ধকার। ভীড়ের বাসটিও ছুঁয়ে দেয় বাঁকুড়া শহর। নেমে যাওয়ার কোলাহলে মানুষেরা ব্যস্ত হতে থাকলেও এই পারিপার্শ্বিকতার বাস্তবতা এড়িয়ে ক্রমশই এক অমিমাংসিত প্রশ্নের খোঁচা অজান্তেই নিজেকে পীড়িত করতে থাকে— 'শমীকের ফিরে আসবার সঙ্গে সহযাত্রী মানুষটির ছবি আঁকা না-আঁকার কি সেই সম্পর্ক্য' ?

'চলুন এখানেই নেমে যাই'! অত্যন্ত আনুগত্যে ভদ্রলোকের পায়ে পায়ে বাস থেকে নেমে পড়লেও এখানে নামবার কথা আমার নয়। পরের স্টপ্‌টা অর্থাৎ লালবাজার স্ট্যান্ডে নামলেই বন্ধুর বাড়ীটা কাছে হত। এই নেমে পড়বার অর্থ, ভদ্রলোকের বাসায় রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। মন্দ কি! সেই মুহূর্ত্তে লোভটাও সামলাতে পারলাম না। একটা রাত্রি একটি মানুষকে বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট না-হলেও অন্তত কিছুটা জানা যাবে, এটুকু আশা করাই যায়। ভদ্রলোক এবার নিজেই বললেন, 'আমার সঙ্গে রাতটা কাটিয়ে গেলে আপনার কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে'? হয়ত এ ধরনের প্রশ্নই আশা করছিলাম। খুব প্রস্তুত একটা উত্তর দিলাম, 'ব্যাপারটা লাভ ক্ষতির মত কিছু নয়। ঠিক আছে চলুন, আপনার ঠিকানাই আজ আমার রাতের ঠিকানা'। অত্যন্ত স্নেহে আমার কাঁধটাকে একবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর কেমন এক বেদনায় ছেঁড়াখোঁড়া সগতোক্তিতে যেন জড়িয়ে গেলেন 'কতদিন ভালো করে আড্ডা দিইনি। কতদিন তেমন কাউকে পাইওনি যার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়'। হঠাৎই নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রলয় বাবু আমার নাম জানতে চাইলেন। বললাম এবং ধীরে ধীরে সন্ধ্যা

ঠেলে আমরা এগুতে থাকলাম বাঁকুড়ার মাটি জড়িয়ে।

চার.

সন্ধান যেহেতু স্পষ্ট, প্রত্যেকটি অনুপুঙ্খ বুঝতে চেষ্টা করছি অত্যন্ত সতর্কতায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেও যে গুঙিয়ে চলেছি অন্য এক তৃষ্ণায়, সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করলাম পথ হাঁটিতে হাঁটতেই ভদ্রলোকের এক আকস্মিক প্রশ্নে। নিতান্তই সহজতায় উনি জিজ্ঞাসা করলেন, মদ্যপানে আসক্ত কিনা ? উত্তর একটি ছোট্ট শব্দেই দেওয়া যেত। কিন্তু কেমন অসহায়ের মত গুঙিয়ে চলেছি 'আসক্ত নই, তবে মাঝেমধ্যে প্রয়োজন হয়ে ওঠে। অন্ততঃ সেইসব মুহূর্তে যখন জীবন মৃত্যু পৃথিবী পরম্পরা সবকিছুই খুব অর্থহীন হয়ে ওঠে, এড়াতে পারিনা। পল্কা বুদবুদের মত সবকিছুকেই মনে হয় ফুটে উঠছে, ভাসছে, ফেটে যাচ্ছে তাৎক্ষণিক ছায়া ছড়িয়ে'। হঠাৎই নিজেকে সংযত করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি সব বকছি ! কেন এত কথা বলছি ! আমার তো শোনার কথা। শুনব জানব বলেই ভদ্রলোকের সঙ্গে হাঁটছি। বস্তুতঃ জয়তীর কাছ থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই একটা অবসাদ আমাকে তাড়া করছে। আর এই মুহূর্তগুলোই মদের কাছে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ নয়। আজ এই প্রলয় মজুমদার আমার সন্ধানবিন্দু। জিজ্ঞাসাও স্পষ্ট, তাই আজ সংযম প্রয়োজন। আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু ফেলে এলেন নাকি' ? নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম 'না, একটা ইমোশনাল ফ্র্যাকচার। চলুন, যাওয়া যাক'। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল মদ্যপানের ব্যাপারে উনিও যথেষ্ট সংযত। খুব প্রয়োজন না-হলে বস্তুটি তাকে আকৃষ্ট করে না এবং প্রয়োজনটিও খুবই আপেক্ষিক। সুতরাং এই রাত্রি সচেতন আড্ডার। হাঁটতে হাঁটতে পীচ্‌পথ ছেড়ে মোরামের রাস্তা বেয়ে একটি বাড়ীর কাছে এসে গেলাম। গেটে যে মহিলা স্বাগত জানালো, বুঝতে অসুবিধে হ'লনা ইনি-ই প্রলয়বাবুর স্ত্রী। সংক্ষিপ্ত শব্দে ভদ্রলোক আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নতুন

বন্ধু। আজ রাত্রে এখানেই থাকবে'। আমার পরিচয় দেওয়া হলেও ভদ্রমহিলার কোন পরিচয় আমাকে দেওয়া হলনা! ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নিলেও একটা খচখচ কিন্তু রয়েই গেল। আবার এও ভাবলাম, হয়ত নিজের স্ত্রীর পরিচয় নতুনভাবে দেবার মধ্যে কোন নতুনতা নেই বলেই প্রলয়বাবু নিশ্চুপ রইলেন! যাই হোক ভদ্রলোকের পায়ে পায়ে এবার বাড়ীটির যে ঘরটিতে এসে ঢুকলাম, সর্বাংশে সেটি একটি শিল্পীরই ঘর। ইতস্তত রং তুলি অর্ধসমাপ্ত ক্যানভাসে ঘরটি একেবারে ঠাসা। অগোছালো বই বাদ্যযন্ত্র, বেশ কিছু কাঠ মাটি পাথরের ছোট বড় শিল্পসংগ্রহ এলোমেলো হয়ে রয়েছে। কিন্তু কেন! এমন হবে কেন! ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দেখে যথেষ্ট রুচিবান এবং শিল্পমনস্ক বলেই তো মনে হল। তবে কি এ-ঘরে ঢোকবার অনুমতি নেই মহিলার! হতেও পারে। ঘরে ঢুকতে না-ঢুকতেই একটি প্রায়-যুবতী, জয়তীর থেকে বছর কয়েকের হয়ত ছোট হতে পারে, ট্রে-তে চা নিয়ে এলো। প্রলয়বাবু মেয়েটিকে বললেন, 'মাকে বলো, কিছু হার্ড খাবার দরকার'। মেয়েটি হেসেই জানালো, 'মা তৈরী করছে, তোমরা পরিষ্কার হয়ে নিতে পারো'। ভদ্রলোক এবার অপেক্ষাকৃত সহজভাবে মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে গিয়ে প্রথমবারের ঠিক বিপরীত কান্ডটি করলেন। অর্থাৎ আমার সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারণ না-করেই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেকটাই বলে ফেললেন— 'পর্ণা। রবীন্দ্রসঙ্গীতটায় ওর একটা অধিকার জন্মে গেছে। ও চাইলে তোমাদের মত ছেলেদের একটি স্থায়ি-র আঘাতেই বেপরোয়া করে তুলতে পারে'। কথাটা বলেই মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি কি খুব বাড়িয়ে বললাম, পর্ণা'? মেয়েটি লজ্জিত হলনা কিন্তু ভদ্রলোকের প্রশ্নে ওর চোখ দুটো কেমন চিক্-চিক্ করে উঠল। কেমন একটা অসহায়তায় মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে নিলো জানালার বাইরে যেখানে অন্ধকার, সেইদিকে। নিজেকে হঠাৎই খুব অপ্রস্তুত লাগছে। পিতা কন্যার অভিব্যক্তির এত জটিলতা দেখতে আমি অভ্যস্ত নই। তবে এটুকু বোঝাই যাচ্ছিল, এই সহজ সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কিছুটা আড়াল রয়েছে। মেয়েটি

এবার আমার দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে বলল 'ওদিকটায় বাথরুম, হাত-মুখ ধুতে চাইলে তাড়াতাড়ি করবেন, খাবার আনছি'। বাবার দিকে একবার আলতো চোখ বুলিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে গিয়েও হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকেই উদ্দেশ্য করে বলল 'শিল্পীদের বেশি বিশ্বাস করবেন না। ওরা তাতে যন্ত্রণা পায়। হয়ত বিশ্বস্ত থাকবার জন্য গোটা জীবনটাই বাজী রাখতে পারে'।

—হঠাৎ একথা এলো কেন? কিছুটা বিরক্তিতেই জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েটি সংক্ষেপে এবং প্রস্তুত উত্তরে বলল, 'কেন এলো, সেটি প্রলয় মজুমদারই আপনাকে বলতে পারবে'। পর্ণা বেড়িয়ে যেতেই ভদ্রলোক অস্থির হাতে একটি সিগ্রেট ধরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হল পর্ণার মধ্যে কি কোথাও পূর্ণিমা লুকিয়ে আছে! পর্ণা কি যুবতী পূর্ণিমার কোন ছায়া, যে শিল্পীকে জড়িয়ে বেঁচে থাকবার প্রতীক্ষায় হেরে গ্যাছে!

কেমন যেন রোম্যান্টিক আচ্ছন্নতায় এসব ভাবতে আমার ভালো লাগছে। যদিও জানি সেদিনের পূর্ণিমা আজ কোন মধ্যবয়সী নারী এবং যে নারী শমীক নামক এক বাবুলোকের সহধর্মিনী। তবু যদি সত্য হত, সত্য হত আমার ভাবনার সংকেত, ভালো লাগতো। বোধহয় ভালোলাগা জুড়ে কোথাও জয়তী রয়ে গ্যাছে। প্রলয়বাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই নৈঃশব্দ ভাঙলেন 'চলুন, মুখ-হাতটা পরিষ্কার করে আসি'। বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলাম, ব্যাচেলারস্ ডেন্-এ যেভাবে টেবিল টুল চেয়ারে খাবার আয়োজন হয়, তেমনই এক টেবিলে সাজানো হয়েছে আমাদের খাবার। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট খাচ্ছি। কারণ বাথরুমে যাবার পথে এ বাড়ীর আভ্যন্তরীণ ভূগোলে একটি খাবার টেবিলও যথেষ্ট পরিপাটি প্রস্তুত রয়েছে দেখলাম। সেখানে না-গিয়ে এই ছায়া-আলোর ভৌতিক পরিবেশে খাবার আসন বিছানো হল কেন? সব কিছুতেই প্রশ্ন বাড়ছে, রহস্য বাড়ছে এবং উত্তর না-পেয়ে হয়ত কিছুটা হতাশ হচ্ছি। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন গৃহকর্ত্রী। হয়ত আমার বিহ্বলতা

মহিলার চোখে ধরা পড়ে গেছে। উনি নিজেই বললেন 'এ ঘরটা কিন্তু ওনার এবং একেবারেই ওনার সেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন'। হাসতে চেষ্টা করলেও আমার জানা-বোঝাগুলো কেমন গুলিয়ে যেতে থাকল কথাটির সূক্ষ্ম খোঁচায়। প্রলয়বাবুই কিছুটা সহজ করে দিতে পুনরায় বললেন— 'আসলে এ ঘরটায় আমি নিজে ছাড়া আর কারও পরিচর্যা পছন্দ করিনা। একটু নোংরা লাগলেও মানিয়ে নেবেন'। ভদ্রমহিলা প্রলয়বাবুকে বললেন 'খাবার আর কিছু প্রয়োজন হলে ডেকো'। আমার উদ্দেশ্যে বললেন 'নতুন বন্ধু হলেও লজ্জা করবেন না। এই মানুষটি বিশেষ কাউকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে না আর যাকে গ্রহণ করে তার জন্য—' কথাটা শেষ করতে দিলেন না প্রলয়বাবু। মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললেন 'লুচি-টুচির পরে কিন্তু আরও এক কাপ কড়া লিকার দরকার হবে'। ভদ্রমহিলা অদ্ভুত চোখে শিল্পীর নামানো মুখটির দিকে নিশ্চুপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বেড়িয়ে গেলেন। এই ছোট্ট দৃষ্টিপাতটুকুও কত অর্থময়। কেমন যেন কুয়াশার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে এদের কথা, এদের দৃষ্টি বিনিময়। প্রচ্ছন্ন একটা একাকীত্বে তিনজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক এক দূরত্বে। খুব— খুব জানতে ইচ্ছে করছে মহিলার অসমাপ্ত কথার ইঙ্গিত। যাকে গ্রহণ করে বন্ধু ব'লে, তার জন্য এই শিল্পী মানুষটি কি এমন করে, কিম্বা এমন কিছুই কি করে না যাকে বন্ধুত্ব রক্ষা করা বলে! আপাতত স্তব্ধতার মধ্যে কেবল আমাদের মুখ নাড়বার শব্দ। হালকা এবং কিছুটা বিষাদময়। খাওয়া শেষ হয়। চা আসে এবং আবারও পর্ণার উপস্থিতি আমায় অস্থির ক'রে তোলে।

মেয়েটাকে ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে ওর কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকতে। প্রায় অসতর্কভাবেই মুখ থেকে বেড়িয়ে আসে একটা অনুরোধ— 'পর্ণা, গান শুনোবে? কিছুটা অবশ হবার সুযোগ পেলে বাসজার্নি-র ক্লান্তিটা কাটত'! মেয়েটি সম্ভবত এমন একটা অনুরোধ পেতে প্রস্তুত ছিল না। এবার সে লজ্জিত হয়। রক্তের

ছল্‌কে ওঠা আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গালদুটো। নিজেকে আড়াল না-করেই সহজ হবার আভিজাত্যে পাল্টা উচ্চারণ করে ' আপনাকে, বাবা একটা ভুল তথ্য দিয়েছে। গানটা বস্তুতঃ মা-ই ভালো গাইতে পারে। শিল্পীর দেওয়া বিশেষণগুলো মায়েরই প্রাপ্য। আপনারা গল্প করুন, মাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি '। পর্ণাকে তাড়াতাড়ি প্রলয়-বাবু থামিয়ে দিলেন।

—ওকে এখন বিরক্ত কোরোনা পর্ণা। রাত্রির খাবার বানাতে তোমার মা বোধহয় এখন ব্যস্ত।

পর্ণা নিজেকে সামলে নিল। অবশেষে ঠিক হল, অন্য আরেকদিন সে গান শুনোবে। পর্ণা বেড়িয়ে যাবার পর আমাদের আড্ডাটাও মোড় নিল অন্য মাত্রায়। রাত্রি বাড়বার সাথেই বেড়ে চলেছে শিল্পী-সঙ্গে এক অপূর্ব শৈল্পিক পরিভ্রমণ। ছবির সাম্প্রতিকতম খুঁটিনাটি গুলোও কত সহজ সম্পাদনায় জানিয়ে দিচ্ছেন প্রলয়বাবু। কত বিচিত্র এই ছবি আঁকার জগত। কত গভীর অধ্যবসায় প্রতিটি অভি-ব্যক্তিতে। সব থেকে আশ্চর্য্য লাগছে, এই মানুষটি সম্প্রতি না আঁক-লেও, ছবির জগতটাই তার ঘুম জাগরণ এবং মোক্ষ প্রাপ্তির। কখনও ভাবতে বাধ্য হচ্ছি, জয়তী নিশ্চয়ই এতটা তাত্ত্বিক হয়ে ওঠেনি কারণ, ছবির এত চুলচেরা বিশ্লেষক হবার পরেও কি কারও পক্ষে ভালো ছবি আঁকা সম্ভব! পরমুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছে, প্রায় প্রতিটি শিল্পীরই ব্যক্তিগত লেখালিখির একটা নিজস্ব জগত আছে এবং সেখানে তারা নিজেদের দর্শনকে বিস্তারিত অভিব্যক্ত করতে পারে। পৃথিবীর শিল্প-আন্দোলনের প্রতিটি ধারার প্রতিটি পুরোহিতেরই এ ব্যাপারে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা রয়েছে। হয়ত যতদূর পর্য্যন্ত অভি-ব্যক্ত হয়ে গ্যাছে, তারওপর কোন স্বতন্ত্র চিন্তাকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তাত্ত্বিক হতেই হবে। ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষক না-হয়ে নতুন কোন ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেদিক দিয়ে প্রলয়বাবুর প্রস্তুতি অনেকটাই পরিণত। এক্ষেত্রে শমীকবাবুর ফিরে আসবার সঙ্গে ভদ্রলোকের ছবি আঁকা শুরু করবার আন্তর-সম্পর্কও একটা অস্বীকার করতে পারছি না। মনে পড়ছে পল্‌ গ'গ্যার কথা।

প্রায় ৪৫ বছর বয়সে সংসার থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন। তারপর প্যারিসে গিয়ে শুরু করেছিলেন ছবি আঁকার জন্য বাঁচতে। ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে, ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মনে হল এখানে রাত্রি কাটাবার উদ্দেশ্য ছিল মানুষটিকে জানা। কিন্তু ছবির ইতিহাস জানতে পারলেও ভদ্রলোক সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা হয়ে ওঠেনি। এরকম মনে হতেই বারে বারে আলোচনা থামিয়ে, পূর্ণিমা এবং শমীকের প্রসঙ্গ ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় হয়ে উঠলাম। যেমন, ওদের সঙ্গে প্রলয়বাবুর দেখা হয় কিনা কিম্বা বাঁকুড়ায় ডেকে নিয়ে এসে শমীকবাবু কি এমন জানাতে চেয়েছিলেন বা প্রলয়বাবু চাকরি নিয়ে এই বাঁকুড়াতেই থেকে গেলেন কেন— এইরকম কিছু প্রশ্ন! আবার এও জানতে চেয়েছি, সেটেলড্ হয়েও ছবি না এঁকে উনি শমীকবাবুর জন্য প্রতীক্ষা করেই বা অহেতুক সময় নষ্ট করছেন কেন? আর যতবার এ-সব প্রশ্নে আমি আলোচনা ফেরাতে চাইছি, কথা থামিয়ে উনি অপ্রস্তুতের মত দরজার বাইরে যেন কিছু দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। অবশেষে একসময় তার দৃষ্টি অনুসরণ করেই আমিও একবার বাইরে তাকিয়ে দেখি, বারান্দার আলোছায়ায় পিলারের পাশে কেউ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ যেন আড়াল থেকে শুনছে আমাদের সমস্ত কথা। মনে হল পর্ণাই। অর্থাৎ এখন বুঝতে পারছি, এসব আলোচনা করতে প্রলয়বাবু কেন এত কুণ্ঠিত। অত্যন্ত ভদ্র বলেই আমার জিজ্ঞাসার মুখটাকে উনি আহত করতে পারছেন না। কিন্তু আমিও যে ভিতরে ভিতরে কি পরিমাণ বেপরোয়া হয়ে উঠছি সেটাও ওনাকে বোঝানো যাচ্ছেনা। কখনও খুব কাপুরুষ লাগছে এই শিল্পী মানুষটিকে— পরিবারের কেউ তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা জেনে ফেলবে ভেবে যদি এই সংকোচ, তবে সেতো শিল্পীর মৃত্যু। আবার কখনও মনে হচ্ছে, এই পরিবারটিতে প্রলয়বাবুর উপস্থিতি প্রায় দেবতার মত। সেই সম্মানের আসনটিকে হয়ত উনি খোয়াতে চাইছেন না। বৌদি তখন যেভাবে এই মানুষটির কথাবুঝ গ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে চাইছিল, তাতে এটুকু বোঝাই যায় ভদ্রমহিলার শ্রদ্ধা আদৌ লোক-দেখানো নয়। আর

বাবার মন পাবার জন্য পর্ণা-তো একেবারে উন্মুখ হয়েই দুরত্বের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আমার অবস্থাটা এই পরিস্থিতিতে একেবারে অসহায়ের পর্যায়ে পৌঁছে গ্যাছে। শূন্যে ঝুলছি! মনে হচ্ছে একপেট খেয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়াটাই সর্বাংশে শ্রেয়। রাত্রিও প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গ্যাছে। হঠাৎই পর্ণা এসে প্রলয়বাবুকে একটু বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন 'একটু বসুন ভাই, পর্ণার মায়ের আজ আবার মাথা ধরেছে, আমি দুটো ট্যাবলেট নিয়ে আসি। কাছেই দোকান, তাড়াতাড়িই ফিরব'। আমিও যেতে চাইলাম সঙ্গে কিন্তু পর্ণা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনাকে যেতে হবে না, বাবা এক্ষুণি ফিরে আসবেন'। ভদ্রলোক বেড়িয়ে যেতেই মেয়েটা ছুটে গিয়ে একটা ডায়েরী নিয়ে এসে আমার ঠিকানাটা লিখে দিতে বলল। মেয়েটির বেপরোয়া আবেদনে কিছুটা বোধহয় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। কাঁপা হাতে দ্রুত লিখে দিলাম ভ্রাম্যমানতার এক অস্থায়ী ঠিকানা। হতবুদ্ধিই হয়ে যাই। আসলে কেউ ঠিকানা চাই-লেই বেশির ভাগ সময়েই কেমন জবুথবু লাগে। বোধহয় বেঁচে থাকবার চাইতেও পৃথিবীবাসের এই গুহা চিহ্নিতকরণ জ্যামিতিটি আমাদের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই ঠুনকো। যে কোন হাওয়াতেই খুলে যাবে পলকা স্তম্ভ। জ্যামিতি ফুস্। দাঁড়িয়ে আছি মেঘস্কন্ধ, জলের ইশারায়! হ্যাঁ, তাই। ঠিকানা অর্জনের এই সন্ধানটাই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে এই শতকে। ঠিকানা! হায়—

আপাততঃ মাঝেমধ্যেই উঠে যাওয়া এক খুদে পত্রিকা অফিসের ঠিকা-নাটাই দেওয়া গেল। যদিও জানি বেশির ভাগ চিঠিই এখান থেকে পাওয়া যায়না। হয় কেউ ছিঁড়ে ফেলে কিম্বা তালা বন্ধ দেখে পিওন ছুঁড়ে ফেলে দেয় কোন খাল-বিলের জলে। প্রশ্ন সেটা নয়, আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, ঠিকানা নেবার মত অন্তরঙ্গতা তো এখনও মেয়েটির সঙ্গে গড়েই ওঠেনি, তবে কি পর্ণা নামক এই বালিকা আমার চাইতেও উন্নত ডিগ্রীর ক্ষুধার্ত! যদি তাই না হবে, তবে প্রলয়বাবুর অনুপস্থিতির সুযোগে এই ঠিকানা সংগ্রহের আয়োজন

কেন ! আমার দ্বিধাজড়িত আড়ষ্টতা হয়ত কিছুটা বুঝতে পেরেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল 'ঠিকানাটা মায়ের প্রয়োজন। বোধহয় এমন কিছু কথা উনি আপনাকে জানাতে চাইছেন, বাবার উপস্থিতিতে যে-কথা জানানো সম্ভব নয়। মা আপনাকে চিঠি দেবেন। আর এই ঠিকানাটা রেখে দিন, এটা মায়ের স্কুলের'। একটি ছোট্ট চিরকুট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবারও বলতে শুরু করল —

—মা কিন্তু আদৌ অসুস্থ নয়। অর্থাৎ মায়ের মাথা-টাথা কিছুই ধরেনি। আপনার সঙ্গে শুধু এই দেওয়া-নেওয়া টুকুর জন্যই বাবাকে একরকম বাইরে বেড়ুতে বাধ্য করা হয়েছে। ঠিকানাটা পরে দেখবেন, এখন রেখে দিন। বাবা চলে আসতে পারে এক্ষুণি।

রোবটের মত ডায়েরীর ভাঁজে ঠিকানাটা রাখতে রাখতে এটুকু বুঝতে পারছিলাম, আমার মস্তিষ্ক চিন্তা করবার স্বাভাবিক ক্ষমতাটাকে এই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে। বিস্মিত হবারও বোধহয় একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। আর এই নবতম বিহ্বলতায় যখন প্রায় খেই হারিয়ে ফেলছি তখনই পর্ণা আবার বলতে শুরু করল,

·বিশ্বাস করুন, আজ একদিন এসেই আমাদের দেখে আপনার যেমন অবাক লাগছে, দীর্ঘদিন একসঙ্গে একবাড়ীতে থেকেও কিন্তু আমার অবাক হবার পালা আপনার থেকে কোন অংশেই কম নয়। এই ভদ্রলোক এবং মহিলাটিকে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝেই সন্দেহ হয় এরাই আমার বাবা-মা তো! ঈশ্বরের দোহাই, আমার জ্ঞান হবার পর এনাদের দুজনাকে কখনও একসঙ্গে হাসতে দেখিনি, গল্প করতে দেখিনি এমনকি দুজনা বেশিরভাগ সময়েই দু-জনার সঙ্গে অপরিচিতের মত ব্যবহার করেন। দুজনার আলাদা দুটো ঘর। কিছুতেই মনে হয় না এরা একে অন্যের কাছে খুব বেশি অপরিহার্য। স্বাভাবিকভাবেই আমার মধ্যেও যে একটা দূরত্ব তৈরী হয়েছে, কথা শুনেই বোধহয় বুঝতে পারছেন। স্কুল থেকেই ম্যাডামদের কাছে আমার একটু 'পাকা' বলে বদনাম আছে। জানেন তো, অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডাইরী কিন্তু আমি পড়েছি। আমার থেকেও কম

বয়সেই সে বোধহয় মারাও গ্যাছে'। কিছুটা থেমে আমার দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখে পর্ণা। তারপর সামনের মোড়াটায় হঠাৎই ঝুপ্‌ করে বসে পড়ে। আবার বলতে শুরু করে, —জানেন, আপনার আগে এ বাড়ীতে বাবার কোন বন্ধুকে আসতে দেখিনি। কেউ আসলেও বাবা কখনও তাকে বন্ধুর স্বীকৃতি দেননি। আপনিই ব্যতিক্রম। মায়ের কাছে অবশ্য শুনেছি বাবার কোনও বন্ধুর কাছে নাকি ভীষণরকম আঘাত পাবার পর মানুষের সঙ্গে উনি মেলামেশা পছন্দ করেন না।

আমি যে ক্রমশই পর্ণার প্রতি খুব উদগ্রীব হয়ে উঠছি, সেটা বোধহয় মেয়েটা বুঝতে পেরেছে। উদগ্রীব এই কারণে, আমার সন্ধানের অনেকটাই ওর কাছে জেনে নেওয়া যাচ্ছে। হয়ত এই সব কথাগুলো ভদ্রলোক নিজে আমায় কোনওদিন বলতেন না। তন্ময় একটি শ্রোতা পেয়ে এই প্রায়-যুবতী মেয়েটিও যেন কথায় মুখর হয়ে উঠেছে। পর্ণা পুনরায় বলতে শুরু করল 'বাবাকে আপনি যে প্রশ্নগুলো করছিলেন, আমি লুকিয়ে সব শুনেছি। ওনার উত্তর শুনতে আমিও আগ্রহী ছিলাম। উত্তরগুলো কেন যে উনি দিলেন না, সেটা বুঝতে পারছি না'। বাধ্য হয়েই এবার আমাকে বলতে হল—

—সেটা তোমার জন্যই। তুমি যে লুকিয়ে সব শুনতে চাইছ, প্রলয়বাবু এটা বুঝতে পেরেছিলেন। পর্ণা এবার মারাত্মক একটি কথা বলল, যে কথা ঠিক এই মুহূর্তে আমি প্রত্যাশা করিনি।

—আপনার মুখে দুটো নাম আমি শুনেছি। পূর্ণিমা এবং শমীক। ও-দুটোর মধ্যে একটি অর্থাৎ পূর্ণিমা কিন্তু আমার মায়ের নাম।

কথাটা শেষ হবার আগেই হঠাৎই পর্ণার মা তাকে ভেতর থেকে ডেকে উঠলেন যেন কিছুটা বিরক্ত হয়েই। আর প্রায় একই সঙ্গে প্রলয়বাবুও ওষুধ নিয়ে ঢুকলেন। বেড়িয়ে যাবার আগে কেমন এক বেদনামাখা অপ্রস্তুত চোখে একটুকরো আলো ছুঁড়ে দিয়েই ছুটে বেড়িয়ে গেলো পর্ণা। প্রলয়বাবু ঘরে ঢুকে অহেতুক অজুহাত সাজাতে বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল। আসলে

কাছের দোকানটা আজ বন্ধ থাকে, সেটা খেয়াল ছিল না। আপনাকে হয়ত বোর করলাম, ক্ষমা করবেন'। ভদ্রলোকের কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে চাইলেও আমার মাথায় তখন নৈঃশব্দের কোন স্টিরিওফোনিক টোনে দ্রুত প্রতিধ্বনি হয়ে চলেছে পর্ণার উচ্চারণ 'আমার মায়ের নামও কিন্তু পূর্ণিমা'। মেয়েটির দীর্ঘ কথাগুলোর প্রায় সবটাই তোলপাড় করছে আমার চৈতন্য। ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে এ বাড়ীর তিন তিনটে মুখ। বিশ্বাস করতে পারছি না এই শিল্পী মানুষটিকে। এমনকি এই ভদ্রলোককে শিল্পী ভাবতেও আমার কেমন সংকোচ হচ্ছে। কেন এভাবে জড়িয়ে যাচ্ছি নিজের মধ্যে জানিনা, তবে এই পারিপার্শ্বিকতায় দাঁড়িয়ে আবারও যে সেই অবসাদটায় তলিয়ে যাচ্ছি সেটা বুঝতে পারছিলাম। পর্ণা পূর্ণিমার আত্মজা। পূর্ণিমার সঙ্গে শমীকের বিয়ে হয়েছিল, সন্তানও। শমীক নেই, পূর্ণিমা রয়েছে। এতদূর পর্যন্ত ভাবতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। খুবই তুচ্ছ এবং সাধারণ যোগ-বিয়োগ। কিন্তু পর্ণার কথা মত এই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা, দুজন অপরিচিতের মত এ বাড়ীতে বাস করেন। এমনকি পর্ণার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষেও এই ব্যক্তি দুজনকে তার বাবা-মা ভাবতে সংশয় হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, শমীক এসে গেলে ভদ্রলোক ছবি আঁকবেন এবং সেই শমীকবাবু ছাড়া আর কোন বন্ধু নেই। তৃতীয়ত, প্রলয়বাবুর এই ঘর এবং ব্যাচেলরের মত জীবন-যাপন— এই সব তথ্য, জিজ্ঞাসা মিলেমিশে কেমন যেন একাকী হয়ে যাচ্ছি। কে মিথ্যে বলছে বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছিনা সত্যটা কি হতে পারে ! আর এই জটিল অঙ্কের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। ক্লান্ত হতে হতে আমার ঘুম পাচ্ছে।

পাঁচ.

রাত্রে আজ কিচ্ছু খাব না। কারো কথা শুনতে চাইনা আর। কাউকে জানতে চাইনা আর। শুধু মুখ মনে পড়ছে। জয়তীর মুখ। জয়তীর শীৎকার। আর্তনাদ 'আমি আর পারছিনা কৃশানু'।

আমিও আর পারছি না জয়া। চোখ জড়িয়ে আসছে। .... বোধহয় চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা সুর উড়ে এসে ঘুম ভাঙাল। চোখ তুলে দেখলাম, দূরে একটা ছোট্ট টুলে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে প্রলয়বাবু বোধহয় আমাকেই স্কেচ করছেন। অন্ধকার বারান্দা থেকে উড়ে আসছে রবীন্দ্র গানের নরম কয়েকটা বাণী। 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে, ও পাখি যা উড়ে, যা উড়ে, যারে একাকী'। সুরে মিশে আছে বিসর্জনের বেদনা। পর্ণা গাইছে, নাকি পূর্ণিমা! জেগে উঠতে দেখেই প্রলয়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন,

—চলুন, খেয়ে নেওয়া যাক্। রাত সাড়ে বারোটা ছাড়িয়ে গ্যাছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে বিরক্ত করিনি।

—গান কে গাইছে?

—পর্ণার মা। ভদ্রলোককে চমকে দিয়ে এবার আমিই বলে ফেললাম 'পূর্ণিমা'! উনি মাথাটা নিচু রেখেই আল্‌তো জবাব দিলেন 'হ্যাঁ, পূর্ণিমা'। দু-একটি মুহূর্ত্ত তারপর। গান থেমে গ্যাছে। ভদ্রলোক এবার সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন। ঝক-ঝকে দুটো চোখ। ততটাই সতেজ উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলেন,

—কমিট্‌মেন্ট শব্দের অর্থ বোঝেন? দায়বদ্ধতা! আয়্যাম্ কমিটেড।

—কমিটেড! বাট টু হুম?

—হুম্?

—হ্যাঁ, জানতে চাইছি কার কাছে আপনি দায়বদ্ধ! পর্ণার কাছে, পূর্ণিমার কাছে নাকি কমিটেড টু ইওর ওন্ প্যাশন্!

—প্যাশন্!!

—হ্যাঁ! যে প্যাশন্ মানবিক ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে আপনাকে শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখায়!

বস্তুত দীর্ঘদিন ধরে যে প্রশ্নগুলো আমায় উত্তেজিত করছিল তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার সে মুহূর্তে আমার ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই আমার প্রশ্নগুলোর মধ্যে যে আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তিটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, ঠিক এতটা বোধহয় প্রলয়বাবু এই মুহূর্ত্তে আমার

কাছে প্রত্যাশা করেননি। উনি কিছুটা যেন থমকে গেলেন। আর আমাদের কথার মধ্যে হঠাৎই একরকম দৌড়ে এসেই ঘরের দরোজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল পর্ণার মা। আমার প্রশ্নের সূত্র ধরেই উনিও খুব তীব্রভাবে বলতে শুরু করলেন—

—বলো প্রলয়, কার কাছে তুমি দায়বদ্ধ ? আমার কাছে ? পর্ণার কাছে ? শমীকের কাছে ? নাকি দায়বদ্ধ তোমার পৌরুষের অহংকারের কাছে ? বলো প্রলয়, আজ আঠেরোটা বছর তুমি আমায় নির্যাতন করেছ। আঠেরোটা বছর ছেঁড়া ক্যানভাসের মত আমায় উপেক্ষা করেছ। কেন ? আজ তোমাকে বলতেই হবে প্রলয়, গ্রহণ যদি নাই করতে পার, পাহারাদারের মত আমায় আগলে রেখেছ কেন ? শুধুই কি বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা ! শমীকের কথা রাখবার অহংকার ! ভালোবাসার প্রতি তোমার কোন দায় নেই— কোনও দায় নেই—! ?

স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে পাথর ছিট্‌কে ফেলে পাহাড়ের নদী ফুঁসে উঠছে সহজ প্রবহমানতার স্পর্ধায়। প্রায় প্রতিটি জীবনেই এমন কিছু অবদমন থাকে যাকে ফিন্‌কি দিয়ে উঠতে হয়, প্রয়োজন হলে নিজস্ব অস্তিত্বও দু-ফাঁক কোরে। আজ আমি যেন এমনই এক রাত্রির সাক্ষি। যে রাত্রি অন্ততঃ পূর্ণিমার নিজস্ব দহন থেকে মুক্তি পাবার তীব্রতায় চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এক শিল্পীর মুখোমুখি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেনা ভদ্রমহিলার চোখ। জলে ধূসর হয়ে গ্যাছে রেটিনা। থিরথির কেঁপে উঠছে সারাটা শরীর। যেন দীর্ঘদিনের এক নিউরো পেশেন্ট। কথা শেষ হতেই প্রলয়বাবু খুব শান্ত স্থির মগ্ন এক দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন পূর্ণিমার চোখে। তারপর ততটাই শীতল এক উচ্চারণে জানালেন— 'রাত্রি বেড়ে গেছে। এই বন্ধুটি আজ আমার অতিথি। বোধহয় কিছু আহার কিছুটা নিদ্রার প্রয়োজন আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা'। এবার কিন্তু সত্যিই আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ভদ্রলোকের নিরাসক্ত উচ্চারণে আমার অনুসন্ধিৎসা খন্ডিত হচ্ছে দেখে চরম বিরক্তিতে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। ভদ্রমহিলার পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় অসভ্যের মত অমার্জিত ভাবে

এক রকম চিৎকারই করে উঠলাম—

—দায়বদ্ধ শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই আপনার কাছে স্পষ্ট! যদি তাই হয় তবে উত্তর দিচ্ছেন না কেন? বলুন, আপনি কার কাছে দায়বদ্ধ!

বোধহয় আমার অধিকারের সীমা ভেঙেই কখন যেন পূর্ণিমার পক্ষ অবলম্বন করতে শুরু করেছি। কিম্বা যেন জীবনের পক্ষে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর যাবতীয় অবিশ্বাস, অবহেলা, অমানবিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঠিক এই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে আমার চিবুক। এটুকু বুঝতেই পারছিলাম, আমার অস্তিত্ব এই মুহূর্তে আর নিরপেক্ষ নেই। আর যুদ্ধ শুরুর আগেই পরাভূত শিল্পীর সমস্ত রক্ত কেমন এক উর্দ্ধচাপে সাদা মুখমণ্ডলকে অতিরঞ্জিত ক'রে তুলল। রাগ দুঃখ ক্ষোভ অভিমান মিলেমিশে একাকার অনুচ্চার এক হাহাকার যেন। কোথায় যেন পৌরুষটা ভেঙে দুমড়ে ক'কিয়ে উঠছে অসহ্য এক ব্যথায়। কাঁপতে কাঁপতে টুলটায় বসে পড়লেন। প্রলয়বাবু। দু-হাতের থাবায় মুখটাকে গিঁথে ফেললেও গোঙানির আওয়াজ তাতে আড়াল হল না। মধ্যরাতের ভয়াবহ আশঙ্কায় কখনও পথের কুকুরগুলো যেভাবে আর্ত্তনাদ ছুঁড়ে দেয় পৃথিবী থেকে বহুদূর দূরের নক্ষত্রের দিকে— এ কান্না আরও বেশি তীক্ষ্ণ, আরও বেশি আকস্মিক। আরও বেশি আশঙ্কায় সুস্থ মানুষের হৃৎপিন্ড কখনও হারিয়ে ফেলতে পারে নিজস্ব গতি। আমি সহ্য করতে পারছি না। বোলপুর বাসস্ট্যান্ডের যে স্থাপত্য-গাঢ় ব্যক্তিত্বের অনুসরণ ক'রে এই রাত্রির ধূসরতায় এখনও দাঁড়িয়ে আছি, খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে তার দীর্ঘদিনের পরিচর্যার ছায়াদীর্ঘ পৌরুষ। অসহায় বালকের মত কোন্‌ সমর্পণের মধ্যে তার এই অবগাহন! শিল্পী কাঁদছে! মনে হল বিরাট একটা সময়জুড়ে তিল্‌তিল্‌ আত্মহননের যে বিশাল পাথরের নীচে গিঁথে যাচ্ছিল একটা সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব, আজ যেন নড়ে উঠেছে। শিল্পীরা যখন কাঁদে, কেঁদে ওঠে জল স্থল অন্তরীক্ষের অন্তর্লীন আত্মা। এ যেন এক জাগরণ। স্থবিরতা ফাটিয়ে ফেলবার এক চূড়ান্ত জ্বালামুখ। এই অবগাহন যেন আজ শিল্পী-প্রলয়কে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়

ফিরিয়ে দিয়েছে। আর এই সত্যের কাছ থেকেই সে যেন উদ্ধার করে শিল্পের শাশ্বত আকাশ। দীর্ঘ বছরের কোন ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক। প্রতীক্ষা সার্থক হোক এই শিল্পমনস্ক মানুষটির। মনে হল এবারের দৃশ্যটায় আমার উপস্থিতির বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। বরং পূর্ণিমা এবং প্রলয়ের, পারস্পরিক সমীক্ষারোক্তি ও দোষ স্খালনের অবকাশটাই বেশি প্রয়োজন। আলতো করে মহিলাকে বললাম, 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। প্রলয়বাবুর এখন আপনাকে বেশি দরকার বোধহয়'। মহিলাও হয়ত এটাই চাইছিলেন। ঘর থেকে বেড়ুতেই ভীতর থেকে লক্‌ করে দেবার শব্দ হল। আর বারান্দার আবছা অন্ধকার এক কোণায় চোখ পড়তেই দেখি পর্ণা দেওয়ালে মাথা এলিয়ে ভারহীন শূন্যতায় আপ্রাণ যেন এক অবলম্বন খুঁজছে। যে কোন অন্ধকারের থেকেও তাকে আরও বেশি নমনীয়, আরও বেশি রহস্যময় লাগছে।

ছয়.

কখনও মুহূর্ত এতটাই পেলব হয়ে ওঠে যার স্পর্শে জন্মান্তরের কোন বিষাদ ছড়িয়ে পড়ে সারাটা সত্ত্বায়। কখনও অযাচিত এক প্রাপ্তিতে আকাশ ফাটিয়ে দিয়ে উড়ে যায় একঝাঁক তীব্রতম ডানা। আপাতত এ মুহূর্ত আমার জাগরণের। ফের সেই অস্থির বালক যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে দাঁতে নখে সহস্র ধমনীর উৎফুল্ল রক্ত-তণ্ডনে। পর্ণাকে হঠাৎই জয়তী বলে ভুল হয় কিম্বা জয়তীই মহাজাগতিক রহস্যময়তায় পর্ণা হয়ে দেওয়ালে ঝুলছে। সত্য যাই হোক, এ মুহূর্ত অপচয়ের নয়। এ মুহূর্ত পুনর্জাগরণের। পর্ণা যেন মধ্যরাতের সেই নিশিপাখির ডাক, ছায়া রেখে দূরে চলে গেলেও বুকটা কেমন 'হায় হায়' করে ওঠে। কোন বিষাদ, প্রবাস থেকে ঘরে ফেরার তাগিদের এক বৈষ্ণবীয় কবিতা। ঠিক এখন পর্ণা যেন অবধারিত এক কান্না, যাকে সহ্য করতে পারি না। যার থেকে নিষ্কৃতি পেতে স্নায়ুশিথীল মাতলামিতে গ্রন্থিহীন পালকের মত দুলতে থাকি হাওয়ায়। এ ভাবেই অপূর্ব বেদনার এক পুরুষ অবয়ব

আকাশ সাঁতরে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াই। ডেকে উঠি আলতো ধ্বনিতে, 'পর্ণা'! যেন এটুকুরই প্রতীক্ষা ছিল মেয়েটির অপরিণত বয়সের। চমকে সহজ পায়ে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আমন্ত্রণ ততটাই সহজ। 'চলুন, ঘরে গিয়ে বসি'। বোধহয় এটাও চাইছিলাম। আহ্বানের সাথেই পর্ণা চলতে শুরু করেছে। সম্মোহক আবেশে আমিও হাঁটছি। এখনও স্পষ্ট নয় পর্ণা কিম্বা জয়তী— কার প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমার কাছে বেশি! কিম্বা দুজনের কেউই নয়! অন্য এক আকাশ ভাসানো শাশ্বত নারীর মধ্যে হয়ত এখন বিলীন হতে চাইছি! পর্ণা কি সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে! হয়ত পাশে বসবে, কথা বলবে, ব্যথা নিয়ে কিছুক্ষণ সময় সাঁতরানো হবে— কিন্তু আমি ক্লান্ত। আর পারছি না। আবারও একটা শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে ফেলতাম আপাত চৈতন্য, পর্ণা বাঁচালো। যে ঘরটায় আমায় ঢুকিয়ে নিলো, আলো জ্বলছিলোই। নিজে হাতেই দরজার আগল দিলো। বিছানা দেখিয়ে বসতে বলল। আমি বসি। অনুগত ভৃত্যের মত নীরব প্রত্যাশায় খুঁজছি ....
'তারপর ?'।

ঘরটা যে মেয়েটারই সেটা বোঝাই যায়। মেয়েটি এবার নীরব দৃষ্টিতে, দূরের নক্ষত্রকে আমরা যে বিস্ময় যে রহস্যের চোখে দেখি, আমাকে দেখছে। হয়ত বুঝতে চাইছে, হয়ত জানতে চাইছে আমার বিশ্বস্ততা। ওর চোখে স্থির রাখতে পারিনা দৃষ্টি। বাধ্য হই চোখ ফিরিয়ে নিতে। নৈঃশব্দের এই পর্যবেক্ষণ আমার কাছে খুব একটা অপরিচিত নয়। জয়তীও যখন তখন হাড় মজ্জা ফাটিয়ে গোপন কোন আবিষ্কারে প্রতিমুহূর্তেই চঞ্চল করে দেয় প্রচলিত এই কঙ্কাল-কাঠামোর রূপ অবয়বটিকে। হয়ত কখনও আমিও বস্তুকে ছুঁতে চাই অন্তর্লীন আরও এক বিমূর্ত রূপময়তায়। এই মুহূর্তে পর্ণার এই অবলোকন অসহ্য লাগলেও, অস্বীকার করতে পারছিনা মেয়েটি এখন খুব একা। পৃথিবীর পিঠের উপর অন্য এক একাকী পর্ণা দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আদি অন্তহীন অন্ধকার ভাসমান-

তায়। যেখানে সবকিছু শুধু লয় হয়ে যাচ্ছে, শুধু মুছে যাচ্ছে কালো এক ঘুমের পর্দায়। এসব মুহূর্তেই খুব তীব্র হয়ে ওঠে কারো বিশ্বাসি দুটো চোখ, বিশ্বাসি দুটো বাহু নীরব সমর্পণের। আপ্রাণ জড়িয়ে থেকে মহাপৃথিবীর সমস্ত ষড়যন্ত্র মিথ্যে করে দিতে ইচ্ছে হয়। এই একাকীত্বই হয়ত আত্মহননের। এই একাকীত্বই নির্মাণের, নির্বাণেরও। পর্ণা হঠাৎই এক জিজ্ঞাসায় যেন অস্থির হয়ে ওঠে। আকস্মিক বলে বসে 'দাঁড়ান, আপনাকে একটা ছবি দেখাচ্ছি'। কথাটা বলেই বুক-সেলফের প্রত্যন্ত পিছনে কোন অব্যবহৃত খাতার ভাঁজ থেকে বার কোরে আনে বেশ কিছু পুরোনো একটা ফোটোগ্রাফ। ছবিটি আমার হাতে তুলে দিয়ে একই সঙ্গে প্রশ্ন করে,

—দেখুন তো, এদের আপনি চেনেন? প্রশ্নটা আকস্মিক। স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ বাড়ে। দেখতেই হয় ছবি মনোযোগ দিয়ে। সম্ভবত বিবাহকালীন এক নবদম্পতির প্রথম উল্লাসের, আকর্ষণের এক সেলুলয়েড-ডকুমেন্ট। পরস্পরের কাছে উভয়ে অপরিহার্য থাকবার অহংকারী ঘোষণা। এদের মধ্যে একজনকে অর্থাৎ নারীটিকে চিনতে পারছি। ইনি পূর্ণিমা, পর্ণার মা। কিন্তু অন্যজন? প্রলয়বাবু নন সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পর্ণার মুখে কোথাও যেন ভদ্রলোকের চেহারার এক চিকণ্ সাদৃশ্য আছে। ঠিক কোন্ কোন্ রেখায় এবং কতটা কিভাবে রয়েছে সেই পরিমিতির চেষ্টাও হাস্যকর হবে। কিন্তু রয়েছে। ভদ্রলোকের রূপগত উত্তরসূরী হিসেবে পর্ণাকে কিছুটা ভাবাই যেতে পারে।

—ভদ্রলোককে চিনতে পারছি না, পর্ণা!

—এটা আমিও জানতাম চিনতে পারবেন না। কিন্তু মহিলাটিকে নিশ্চয়ই চিনতে পারেছেন! কথাটার সহজতায় ওর দিকে মনোযোগ আটকে যায়। এবার প্রায় চমকে দিয়ে মেয়েটি পুনরায় বলে উঠল,

—ছবির ভদ্রলোকটি যদি আমার বাবা হন, তার মেয়ে বলে আমায় চিনে নিতে খুব অসুবিধে হবে?

—কিছুটা মিল যে রয়েইছে সেটা আমিও ভেবেছি। অন্ততঃ প্রলয়বাবুর থেকে এই ভদ্রলোকের মুখের ছায়া তোমার মুখে অনেকটাই রয়েছে। আড়ালের প্রয়োজন উপেক্ষা করেই সত্য কথাটা বলে ফেললাম। আর আমার উচ্চারণ শেষ হতে না-হতেই আশ্চর্য উন্দাম এক জলের ঝাপ্‌টার মত ছাদ মেঝে নৈঃশব্দের ফ্রেমে বাঁধা যাবতীয় বাস্তবতাকে ভেঙে ফাটিয়ে ছুটে এসে মেয়েটা আছড়ে পড়ল বিছানায়। মুখটা তুলোয় গিঁথে ফেলতে চাইলেও চাপা একটা অসহ্য গোঙানি সহস্র বিমান আক্রমণের চাইতেও অবধারিত এক ধ্বংসের সম্ভাবনায় ওতপ্রোত হয়ে উঠল। (পরে জেনেছিলাম এই কান্নার উৎসে ছিল কিছুটা আনন্দও)। প্রকৃত পক্ষে সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, একটা অস্তিত্ব তার শিকড়বাকড় হারিয়ে অন্ধকারে ঝুলে পড়েছে অমোঘ কোন অসহায়তায়। এখন সে যেন কেন্দ্রচ্যুত। পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন তার শিকড় বাকড় হাওয়ায় ভাসছে। যে জিজ্ঞাসা এতদিন আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল, যে সংশয়ে সে সাবধানি দূরত্ব রেখে বেড়ে উঠছিল এ বাড়ীটায়— সেই প্রচ্ছন্ন গোপন ধারণাটিরই যেন এক সতর্ক সমর্থন পেয়ে গ্যাছে আমার ছোট্ট ও সংযত উচ্চারণটুকুতে। প্রলয়বাবু তার বাবা নন। তার বাবা অন্য আরেকজন যার সঙ্গে মিলিত হবার ছবি রয়েছে তার মায়ের। যে ছবিটি সে যত্ন করে আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। অর্থাৎ যে ছবিটিও এ বাড়ীর অন্য সদস্যদের অসতর্কতা থেকে কোন এক-দিন হঠাৎই সে কুড়িয়ে পেয়েছে। তাই এই গোপনীয়তা, তাই এত আড়াল। দরজায় আগল্‌ বাঁধা অগোচরে, এমনই এক জিজ্ঞাসা থেকে মেয়েটি মুক্তি পেলেও আমার মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে এক অপরাধ বোধ। এ-বাড়ীর সহজ কিম্বা আরোপিত সাম্যকে একের পর এক কি ভাবে ফাটিয়ে চলেছি একটা রাত্রেই। মেয়েটি কি কাল ফের সহজ মুখ উঁচিয়ে প্রলয়বাবু কিংবা পূর্ণিমাদেবীর সামনে দাঁড়াতে পারবে সন্তানের অধিকার নিয়ে! পর্ণার পক্ষে যে সম্ভব নয় সে পরিচয় পাওয়াই গ্যাছে। এতটা আত্মসচেতন মানুষের পক্ষে ছদ্মবেশ সাজিয়ে রাখা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। অন্ততঃ পর্ণার বয়সটাও

সমর্থন যোগ্য বিদ্রোহেরই। অর্থাৎ ও-ঘরে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা যখন প্রার্থিত অবকাশে নিজেদের ছেঁড়া গাঁথার ভাসানে নেমেছে, এ-ঘরে তখন অন্য এক ক্ষরণের মুখোমুখি আমি যেন থেমে আছি। প্রথমে অপরাধবোধটা কিছুটা পিড়ীত করলেও ক্রমেই প্রবল যুক্তিতে গড়ে নিচ্ছি আনন্দের ভূমি। বেশ করেছি। সত্যকে প্রকাশ করবার দায় যেমন সাংবাদিকতা নামক তাৎক্ষণিক জীবিকায়, কবিতারও যে আকাশ ছুঁয়ে প্রায়শই বেঁচে উঠি— সেও তো সত্যকেই প্রকাশের প্রয়াস। অভিব্যক্তিতে প্রজন্মের চিবুক ধুয়ে দেওয়ার জন্যই তো শব্দসাধনা। কখনও যদি কারও ধমনীজুড়ে আপেক্ষিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে চিরন্তন আত্মসাক্ষাতের প্রোজ্জ্বল আগুন নেচে ওঠে, তবেই সার্থক হবে জীবন জীবিকা। এমন তো কতদিন কত মুহূর্তে আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেছি। পর্ণার কথা ভেবে এখন তবে এত ব্যস্ত হচ্ছি কেন! সে এখন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবে সেটাই কাঙ্খিত। প্রত্যক্ষ সংঘাত থেকে কুড়িয়ে তুলবে নিজস্ব পরিণতি। তবেই তো মানুষ জন্ম। তবেই তো সঠিক অর্থে বাঁচা। জয়তীকে শ্রদ্ধা করি তার এই ঝুঁকি নেওয়ার সাহসের জন্য। জয়তী সত্যকে পেতে চায় শরীরে মনে অন্তর্লীন অভিজ্ঞতায়। সুতরাং আমি খুশী। আমি আনন্দিত। এ-বাড়ীতে এই রাত্রিবাস ক্রমেই সার্থক করে তুলছে আমার জীবন। পর্ণার পরিণতি কি হবে সেটা নির্ধারণ করবার দায় আমার নয়। সেটা ভাববে সে নিজেই। পরিণতির কথা ভাববে সংস্কারক। শিল্পী বা কবির দায় সত্যের মুখোমুখি মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার। এবার আমায় উঠতে হবে। মানসিক তালগোলের মধ্যে বিছানায় উপুড় মেয়েটির অস্তিত্ব কখন যেন ভুলে গিয়েছিলাম। নীতিবাগিশের মত নিজের সঙ্গে যুদ্ধে যখন সচেতন আমিটারই জয় হল, এক মানবিক আবেগে হঠাৎই উল্লসিত হয়ে উঠলাম পর্ণার ব্যথার পাশে বসতে। পাশাপাশি মনে হল ঠিক এই মুহূর্তেই মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় আদিম এবং অরাজক এক ছিন্নমূল সত্তা। মূল্যবোধহীন চরম বন্যতায় ঠিক এই মুহূর্তেই তছনছ করে দিতে চায় সামাজিক যাবতীয় নীতি অনুশাসন এবং

সাজানো আভিজাত্য। যাই করুক, পর্ণা এখন ধূসর কোন অশ্বের সওয়ারী। কান্না পেরিয়ে যেন মেয়েটা ছুটছে পৃথিবীর কোন শেষ ভূ-খন্ড দিয়ে যার ও-পিঠেই অন্ধকারের এক সমুদ্র। নিজেকে খুব দীর্ঘ লাগছে। দীর্ঘ বৃক্ষের মত ঋজু ও ছায়ামুখর। অন্য কারো ব্যক্তিগত দুঃখবোধের সিঁড়িতে পা দিয়েই বোধহয় মানুষ কাছাকাছি হবার সুযোগ পায়। দুটো হৃদয়ের পারস্পরিক উত্তাপে দীর্ঘ হয়ে ওঠে যৌথযাত্রা। ব্যক্তিগত ক্ষরণের পাশে বসবার যে সুযোগ পৃথিবী আজ আমাকে এনে দিয়েছে, সেই তো তীর্থ। এই তো সেই পবিত্র স্নান যে অবগাহন থেকে শুভ্র হয়ে ওঠে একেকটি অস্থির অস্তিত্ব। চিরকালীন এক প্রেমিকের মত খুব আলতো ক'রে পর্ণার পাশে গিয়ে বসি। স্পর্শ করি। আদি কোন পিতার মত মেয়েটিকে আকর্ষণ করি নিবিড় উত্তাপে। পর্ণা শিহরিত। আন্দোলিত হয়, আলোড়িত হয়ে ওঠে নম্র অনুভবে। আকস্মিক আমার বুকজুড়ে আছড়ে পড়ে ওর মুখ। সবল কোন ভূমিকে জড়িয়ে পাড়ের কোন গাছ—জলোচ্ছ্বাসে দীর্ঘ করতে চাইছে উন্মীলন। আমার নিঃশ্বাসে মিশে গ্যাছে ওর পরমাণু। ক্রমেই স্থির শান্ত এক আশ্রয়ে জেগে উঠছে এক মানবী, একজন নারী। প্রবল এই ভাঙনে কিভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমি! পিতার মত, মহান কোন প্রেমিকের মত স্থির। এই অলৌকিক পরিবর্ত্তন এর আগে কখনও বুঝিনি। এর আগে কখনও বুঝিনি কতটা সহ্যতা আছে আমার স্নায়ুতে। কিন্তু পারছিনা আর। পর্ণার শান্ত স্থির শরীর থেকে এবার যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে অন্য বাষ্প। কেঁপে উঠছি। বোধহয় মেয়েটাই টের পায় মানবিক এই ক্ষুধা জাগরণ। এই জৈব চুম্বকত্ব। ওর বাঁধন খুলে যায়। মুখটা সরিয়ে নিয়ে একবার তাকায়। চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে চোখের রেটিনায় কিছুটা লজ্জা, কিছুটা নিবিড়তা, কিছুটা সংশয়। আমিও অলস করে দিই হাতের প্রান্তীয় শৃঙ্খল। কেন যেন পারছিনা আর। আর কোন পিতৃত্ব নেই, অলৌকিকত্ব নেই, চরম লৌকিক এক তৃষ্ণাময়তা। সহজ চোখে তাকাতে পারছিনা কেউ। পর্ণা উঠে পড়ে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব স্পষ্ট ক'রে একবার

দেখে আমাকে। এই দৃষ্টিপাতে স্পষ্টতা থাকলেও, অন্য এক কাতরতা ছড়িয়ে আছে বোঝাই যায়। কিন্তু এই নেশায় জড়িয়ে যাওয়া আমার কাঙ্খিত হলেও, পর্ণাকে প্রলুব্ধ করা হয়ত এখন উচিত হবে না। নীরবতা ভেঙে বলতেই হয় 'পর্ণা, তোমার জীবন বোধহয় আজ থেকে শুরু হল'। দরোজাটা খুলে দিয়ে মেয়েটি এগিয়ে এসে ছবিটা কুড়িয়ে নেয়। পুনরায় আগের জায়গাতে ওটিকে গুছিয়ে রেখে ঘুরে গিয়ে বিছানার অন্য কিনারে বসে। আগের মতই সপ্রতিভ, সহজ, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আবার। কিন্তু এই ঘূর্ণি উড়িয়ে উচ্চারণের যে শাব্দিক আঁচড় আমার দিকে মেলে ধরল, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সচরাচর এতটা মারাত্মক উচ্চারণ সহজে মেলেনা। অন্ততঃ সমাজমুখী পাকদন্ডী বজায় রাখতে পারিপার্শ্বিক মানুষদের ভাবনা এবং অভিব্যক্তির গড়-চিবুক যেমন ফ্রেম হয়ে গেছে, পর্ণার উচ্চারণে তার ব্যতিক্রমই তার প্রতি মনোযোগী হতে আমায় আকর্ষণ করছে। চরম এক প্রবণতায় হয়ত ওর যাবতীয় ভালোমন্দ ছুঁয়ে আমিও নেশার্ত হয়ে উঠছি—এমনও হতে পারে। কিন্তু কথাগুলো বোধহয় খুব স্বাভাবিক ছিল না। অন্তত ওর বয়সের মেয়ের ঠোঁটে আগে কখনও শুনিনি বোধহয়—

—পূর্ণিমা দেবী অর্থাৎ আমার মা, প্রলয়মজুমদারকে যে কথাগুলো বললেন, ওগুলো বলবার অধিকার বোধহয় ভদ্রমহিলার নেই। ওই শিল্পী মানুষটিকে আমার জ্ঞান হবার পর শুধু নিঙরে নিতে দেখেছি। কোন্ অধিকারে মা এতটা উদ্ধত জানিনা, তবে প্রলয়বাবুর অপরাধটুকু আগেই টের পেয়েছিলাম, আজ স্পষ্ট হলাম।

—কি অপরাধ ? কোন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন উনি ?

—পূর্ণিমা দেবীকে একদিন এই শিল্পী ভালোবেসেছিলেন—এটাই তার অপরাধ !

এখানেই যদি কথা শেষ হয়ে যেত, প্রচলিত গল্পের মত তবুও হয়ত পৃষ্ঠা উল্টিয়ে রেখে কিছুটা ঘুমিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু জীবন সবক্ষেত্রেই প্রচলিত ছকে হাঁটেনা বলেই এত সাহিত্য সৃজন।

পর্ণার পরিণত হয়ে ওঠবার অনুকূল মনটার কাছে এসব জিজ্ঞাসা, সন্ধান যে যথেষ্টই গম্ভীর ছায়া ফেলবে, সেটা মানতেই হবে। অনেকে ব্যক্ত করতে পারে, অনেকে পারে না। স্পষ্ট রেখা টেনে পর্ণা যে দ্বন্দগুলো বুঝতে ও বোঝাতে চাইছে, এটাই প্রমাণ করে বয়সের তুলনায় সে অনেকটাই পরিণত। কিম্বা এটাও বলা যায়, এ বয়সে এভাবে বিশ্লেষণাত্মক জীবনবোধ তৈরী হওয়াটাই উচিৎ। কিন্তু আমাদের পরিচিত বৃত্তে ঠিক সেরকম অনুকূল পরিবেশ যেহেতু তৈরী নয়, স্বাভাবিকভাবেই পর্ণার সমবয়সের তরুণ-তরুণীদের প্রায়শই খুব অ্যাভারেজ্ মনে হয়। ছকবাঁধা জীবনচর্চার এক প্রচলিত প্রজন্ম।

প্রকৃতপক্ষে মেয়েটার মুখে এবার আরও যে কথাগুলো ধ্বনিত হল, সেই উচ্চারণে যেন রাত্রিও স্পর্ধিত হয়ে উঠল জাগিয়ে রাখতে। মানবিক আকাঙখার এক ধূসর সিম্ফনি। অবিশ্বাস্য হলেও বুঝতে পারছি অন্তর্গত সঙ্গীতের মত কোথাও ছড়িয়ে আছে গভীর কোন বেদনার ব্যাপ্তি। যে বেদনা কখনও উপশম হয়না, অতৃপ্তি-তে বেড়ে চলে প্রতিমুহূর্তেই জখম। মেয়েটিকে এখন আর কিছুতেই একটি বালিকা ভাবতে পারছিনা। ও' যেন সেই চিরকালীন এক ইভ্। নিষেধকে চুরমার কোরে পুরুষকে বাধ্য করে নিষিদ্ধ ফল খেতে। কিম্বা পর্ণা নিজেই যেন সেই অবদমিত অগ্নি, অনুশাসন ধূলিসাৎ কোরে সর্বাংশে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রার্থিত কাঁটায়। সে সব থাকুক বরং তার উচ্চারণটুকু শোনা যাক। স্পষ্ট এবং মার্জিত ভাষায় সতেরো কি আঠেরোর মেয়ে এমন একজন মানুষ সম্পর্কে কথাগুলো বলছে, যাকে সে আজ পর্য্যন্ত জেনে এসেছে পিতা বলে।

—প্রলয় মজুমদারের এই নির্বাসন, এই দূরত্ব সাজিয়ে রেখে একাকী জীবন যাপন, আমার ভালো লাগে। একজন মেয়ে হিসেবে আমার কাছে উনি প্রথম পুরুষ। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, প্রলয়বাবুকে আমি ভালবাসি।

— কিন্তু ভদ্রলোককে তো তুমি পিতা বলে জানো। এখনও তো

প্রমাণই হয়নি উনি তোমার বাবা নন !

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েই মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক বোকাবোকা মূল্যবোধকেই যেন আওড়ে গেলাম। মেয়েটি যেন একরকম লাফিয়ে উঠল তীব্র চিৎকারে,

—ব্যাস থামুন। কোন বাজে যুক্তি আমি শুনতে চাইনা। I Love him and it is truth. উনি পিতা হলেও সেই পিতৃত্বের কোন মূল্য আমার কাছে নেই। ওর সঙ্গে আমার একটাই সম্পর্ক—একজন শিল্পীর সঙ্গে তার প্রেমিকার যে সম্পর্ক হওয়া উচিত। আর এটুকু বোঝবার মত পরিণত বোধহয় আমি হয়েছি। আপনাকে উনি বন্ধুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাই আপনার কাছে এই সত্যটি স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আপনি এই সত্যকে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা সেটা আপনার ব্যাপার। আবারও বলছি— আই লাভ হিম্ এ্যান্ড লাভ টু ইটস্ এক্সট্রীম।

—যদি এটাই সত্য হয় তবে ছবির পুরুষটি তোমার বাবা হতে পারেন শুনে ভেঙে পড়লে কেন ?

—উত্তর শুনে চমকে উঠবেন না তো !

—না। তুমি বল—

—ভেঙে পড়েছিলাম একটা আশঙ্কায় !

—আশঙ্কায় !

—হ্যাঁ। হঠাৎই মনে হল, আজ এই আঠেরো বছর পর পূর্ণিমা মানে আমার মা শিল্পীকে আবার ছিনিয়ে নেবে না তো! উফ্, অসহ্য ! আমি আর ভাবতে পারছিনা। প্লীজ, আর কিছু জানতে চাইবেন না।

দুহাতে মুখ লুকিয়ে পর্ণা যে আবারও তলিয়ে যাচ্ছে নিজের সঙ্গেই এক বোবা যুদ্ধে সেটা বোঝাই গেল। ওকে আশ্বস্ত করতেই কিম্বা ওর অল্প বয়সের ভুলটাকে ভেঙে দিতেই আমিও কেমন জেদের বশেই বলে উঠলাম 'প্রনয় বাবুর কাছে তুমি হয়ত ওর মেয়ের মতই স্নেহের পাত্রী, উনি বোধহয় সাজানো হলেও নিজের পিতৃত্বকে

স্বীকারই করেন'। এবার কিন্তু পর্ণার সাজানো গাম্ভীর্য ছিঁড়ে প্রকৃতই এক কিশোরীর মুখ বেরিয়ে এলো। তার উচ্চারণের মধ্যেও ছেলেমানুষীর আব্দার— গ্রামের মেলায় সেই শালপাতায় জিলিপী নিয়ে বেণী দুলিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটে যাওয়া বালিকার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। লজ্জাহীন উত্তাপে পারিপার্শ্বিক জড়িয়ে নেবার আকাঙ্খায় দিশেহারা লাল সবুজ রিবন্ উড়ে এলোমেলো হাওয়ায় রেখা ফেলছে। পর্ণা কেমন আঁতকে উঠে বলতে শুরু করল—

—আপনার ধারণা ভীষণ ভুল। এ বাড়ীতে একজন কেয়ার-টেকার ছাড়া ওর কোন অস্তিত্বকে মা এতদিন গুরুত্বই দেয়নি। ওর অর্জিত কোন অর্থ, মা ছোঁয়না। আমাকেও তার কোন উপহার দেওয়া বারণ। মা শুধু প্রলয়বাবুর পরিচয়টাকেই ইচ্ছে মতন ব্যবহার করছেন। অন্ততঃ আমার পিতা সাজাবার প্রয়োজনটা সামাজিকক্ষেত্রে অনেকটাই প্রবল। ভদ্রলোকও কেমন অসহায়ভাবে এই সাজানো সম্পর্ক্যের ফাঁস জড়িয়ে এই বাড়ীটিতে বাস করছেন। ও' আমার কাছে একটা রহস্য। ওনার ভালোবাসবার ধরণটি আমি বুঝি না। কিন্তু আমার প্রত্যাশা শিল্পীটি যথেষ্টই বোঝেন, এটুকু বিশ্বাস আমার তৈরী হয়েছে।

সাত.

প্রেক্ষিত যাই হোক না কেন, প্রস্তাবনায় কোন কৃত্রিমতা নেই সেটা বুঝতেই পারছি। আর ক্রমেই সন্ধ্যে থেকে জমে ওঠা কয়েকটি প্রশ্নের সরল সমাধান ততোধিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, এ বাড়ীর গেট দিয়ে ঢোকবার মুখে সম্পর্ক্যের লৌকিক পরিচয়ের উল্লেখ, প্রলয়বাবু কেন এড়িয়ে গেছেন। বস্তুতঃ অপ্রয়োজনীয় মিথ্যের আশ্রয় না নিয়েও যে, কয়েকটি জটিল বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়, সেই কৌশলটা আপাততঃ আমার এক আবিষ্কার। আবিষ্কারের অভিনবত্বে কিছুটা যন্ত্রণা মিশে থাকলেও, তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলবার শৈলীতে শিল্পী যথেষ্টই সার্থক। কিন্তু এখন আর কেন যেন পর্ণাকে সহ্য করতে পারছি না। গল্পটি

থেকে কিম্বা এই বাস্তব ঘটনা বিন্যাস থেকে যদি নিজেকে পৃথক করতে পারতাম, বোধহয় ভালো হত। কিন্তু সত্যের বিকৃতি ঘটাতে চাইছিনা। চাইছিনা বলেই নিজস্ব প্রতিক্রিয়াটুকুও যদি সে রাত্রি থেকে কুড়িয়ে সঠিক ব্যক্ত করতে না পারি, তবে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুতরাং পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। এই পূর্ব-ধারণাটিকে প্রশ্রয় দিয়েই পরবর্তী সংযোজনার দিকে হেঁটে যাওয়া সম্ভব।

সেরাত্রের স্বীকারোক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পর্ণার প্রতি যেমন বিস্ময় বেড়ে উঠেছে, ঠিক ততোটাই সঞ্চারিত হয়েছে এক প্রচ্ছন্ন বিরক্তি। মেয়েটির বয়স এখনও যৌবনকে পুরোপুরি জড়াতে পারেনি, সেটা আগেই বলা হয়েছে তথাপি ওর আকাঙ্খা কত জটিল। কত তীক্ষ্ণ ওর কন্‌ফেশন্‌। ঋজু বল্লমের মত মেয়েটা বিদ্ধ ক'রে তুলছে আমার আধুনিক মননের ছদ্মবেশ। ইউরোপীয় সাহিত্যের উন্মুক্ত রাস্তায় যদি পর্ণার সঙ্গে পরিচিত হতাম তবে এভাবে কাঁটায় খচ্‌খচ্‌ করত না মেনে নেওয়ার গোড়ালি। কিন্তু প্রেক্ষাপটজুড়ে এক গ্রাম-বাঙলা, ভারতীয় সভ্যতার এক রক্ষণশীল ভূখন্ড। হয়ত সে কারণেই টলে উঠছি মাঝেমধ্যেই মেয়েটির পছন্দ অপছন্দ, রুচি অভিব্যক্তির, তীব্র-আধুনিক জটিলতার পরিচয় পেয়ে। হোক না সাজানো পিতা, তবুতো পিতারই লালিত মাধুর্য্য ছুঁয়েই সে বেড়ে উঠছে। এই প্রচলিত মূল্যবোধটিকে কত সহজেই অস্বীকার ক'রে, সেই প্রলয় মজুমদারের মধ্যেই মেয়েটি সাজিয়ে তুলছে ভালবাসার পুরুষ-মুখ। আজ রাত্রের আগে পর্য্যন্ত, বরং বলা ভালো এই মুহূর্ত্তের আগে পর্য্যন্ত এমন কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়নি যা প্রমাণ করে ভদ্র-লোক অর্থাৎ প্রলয়বাবু তার পিতা নন। অথচ কি আশ্চর্য্য বেপ-রোয়া এই বালিকা, চিরন্তন সম্পর্কের লেবেল ছিঁড়ে, ফাটিয়ে অন্য এক রক্তমাংসের অধিকারে পেতে চাইছে এই মানুষটিকে। যে অধিকার জন্মসূত্রে নারী অর্জন করে পুরুষ সম্ভোগের। পর্ণার উচ্চারণে 'ভালোবাসা' নামক এক নম্রতা ধ্বনিত হলেও, গোপনে যে

অন্য এক জান্তব ক্ষুধার আগুনে কতটা লেলিহান তার পরিচয় কিছুটা আমিও পেয়েছি তবু লজ্জাকে আড়াল ক'রে ছুটে সে পালিয়ে যায়নি এ-ঘর থেকে। বরং আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে তার প্রার্থিত পুরুষের প্রতি অধিকারের উচ্চারণ তুলে দিয়েছে আমার শ্রবণে। এমন এক পুরুষ যার পঞ্চাশ পেরিয়ে গ্যাছে বয়স। ওর মুখেই শোনা, এবাড়ীর অন্য নারী যিনি ওর মা বলেই পরিচিত, তিনিও আজকে রাত্রেই সেই একই পুরুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন সম্পর্কের অধিকার নিয়ে। আর এই গোপন দ্বন্দ্বেই ছিঁড়ে যাচ্ছে মেয়েটার বুক।

এমন এক জটিলতাও যদি সভ্যতার বিস্ময় না হয়ে ওঠে, অহেতুক শূন্যোদ্যান ঘিরে মানবিক অহংকারের আশ্চর্যতম ক্রমাংক সাজাবার প্রয়াসটিও হাস্যকর হয়ে উঠবে। আপাতত যে কথা বলতে চাইছি— মেয়েটির প্রতি আমার বিরক্ত হবার কারণ কিন্তু চাপা বৈরথ। পর্ণা বহু আগেই আমার কাছে পছন্দের ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেও, ব্যক্তিগত আকাঙ্খা দিয়ে ওকে বশে আনতে পারছিনা। আমারই বুক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বসে বসে ওর ভালোবাসার গল্প শুনোচ্ছ এমন এক মানুষকে ঘিরে— যার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান দু-একটা যুগের। খুব গোপন হলেও পরাজয়ের একটা ক্রোধ যেন চিন্‌চিন্‌ কোরে উঠছে। এর পরেও কি বিরক্ত হওয়া খুব অযৌক্তিক কোন ব্যাপার। পারছি না, ওকে আর সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না মোটেই। বরং এক মাংসময়তায় প্রতিশোধের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে উঠছে ওর শরীর জুড়ে। বেশীক্ষণ মেয়েটির মুখোমুখি থাকা মানে আমাকেও লাম্পট্য ঢাকতে হবে ছদ্মবেশ সাজিয়ে। হয়ত ছদ্মবেশ আছড়ে পড়বে স্বতঃস্ফূর্ত বন্যতায়। তীব্রতম স্নায়ুর পীড়া সংযত করেই পায়েপায়ে এঘরের দরজা পেরিয়ে যাওয়াটাই সভ্যতার শিক্ষা। পেরিয়েই যাচ্ছিলাম চৌকাঠ। পেছন থেকে পর্ণা ডাকল 'শুনুন'! ঘুরে দাঁড়ালাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ রাখলাম ওর দৃষ্টিতে। মেয়েটি এগিয়ে এলো। খুব কাছে প্রায় নিঃশ্বাসের কাছাকাছি। আলুতো

কোরে বলল- আপনি প্রলয় মজুমদারের বন্ধু। আমারও বন্ধু হবেন!!

হায়, আমি পরাজিত। এ এক শোক। সমস্ত পৌরুষ যেন ভেঙে গেল চুরমার হয়ে। ক্রোধ নেই, দ্বৈরথ নেই, প্রতিশোধ স্পৃহাও যেন কখনও ছোঁয়নি আমাকে। নাবাল কিশোরের মত আমি যেন পরিত্রাণ পেয়ে গেছি কিশোরীর কাছে। একটা উচ্চারণেই একজন মানুষ এতটা আদরণীয় হয়ে উঠতে পারে বোধহয় আগে কখনও বুঝিনি। কি সহজ একটা আব্দার। পুরো একটা শৈশব যেন হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চাইছে। কিছু জড়িয়ে টলমল হাঁটতে চাইছে। প্রখর আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে নিয়েছি। সেই বাঁধনে যেন পর্ণা কোন নারী নয়, যেন হাজার বছরের এক দুর্বল শিশু—প্রযত্নের রোদ তুলে দিচ্ছি ওর অস্ফুট অসহয়তায়। পর্ণা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পুনরায় বলে উঠল—'বলুন না, আমার বন্ধু হবেন'! এবার অসহায় হবার পালা আমার। বন্ধু হবার যোগ্যতা কি অর্জন করেছি এখনও! বন্ধুত্ব তো একটা শব্দ নয় শুধু, একটা শপথ, একটা অঙ্গীকার। বন্ধু হবার জন্যও বাস্তব পৃথিবীতে কিছু শর্তপূরণ করা প্রয়োজন। সক্ষম একটা মন, স্পষ্ট দাঁড়াবার দু পায়ের একটা ভূমি, প্রতিশ্রুতি উচ্চারণের সটান্ একটা স্পর্ধা। কিন্তু কোনোটাই আমার এ ভাসমান জীবনে, ভাসমান ছত্রাক জীবনে এখনও স্পষ্ট হয়নি। কিভাবে উচ্চারণ করব পর্ণা, বন্ধু হবার যোগ্যতা এ পৃথিবীতে সবাই অর্জন করেনা বা করতে পারেনা। অন্ততঃ আমি যে হয়ে উঠতে পারিনি সেটাও ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

মুখ ফিরিয়ে গাঢ় বেদনায় হয়ত হাসতে চেষ্টা করছি, কাঁদব না বলেই। কান্না মানায় না আমাদের। ছটফট একটা অস্থিরতায় ঠোঁট নিঙড়ে নামে কয়েকটি ধ্বনি শব্দ দু-একটি পংক্তি। কবিতা আমার উদ্ধার। শপথ উদ্ধার। নিস্তব্ধ দহন থেকে কখনও কখনও এই উদ্ধারে জীবনের প্রতি সম্পৃক্ত হয়ে উঠি ভালোবাসায়। কখনও সম্পৃক্ত হই মৃত্যুকে অস্বীকারের প্রবণতায়। কিছুটা অসচেতন ভাবেই

আকস্মিক আওড়ে উঠি,

— 'এত জোরে বলতে পারিনা / জেগে আছি ঘুমে নির্বাণে
তবু থাকো ওতপ্রোত / ক্ষুধায় যত্নে ছোট পাতা
তবু থাকো আগুনে কাঁটায় / নির্জন টিলার মত ভোরে'—

—কার লাইন ?

—কি জানো ! বোধহয় স্মৃতি নয়, নির্মাণ !

—কার ? আপনার !

—হ্যাঁ, হয়ই তো। কখনও কখনও দু-এক পংক্তি তো লেখা হয়ই। আচ্ছা, আসছি পর্ণা। একটু বাইরে বেড়ুই।

—এখন এত রাতে কোথায় বেড়োবেন ! আপনি ঘুমোবেন না ?

— হ্যাঁ, সেটাও খারাপ হবে না, কিন্তু কোথায় ঘুমুবো বলতো ?

—আমার বিছানায়। আপত্তি আছে !

— বিছানায় আপত্তি ! এবং সেটা তোমার !

—এ ঘরটা আমারই ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। এ বিছানাটায় আমাকেই প্রতিদিন শুতে হয়। বন্ধুত্বের দাবীতে আজ এটা আপনার অধিকারে।

—শুধুই পালঙ্ক ! পালঙ্কের নম্র তন্তুময়তা ! তাই হবে। অন্ততঃ তোমার কিছু রেণুতো ছড়িয়ে আছে এই তুলোর ক্যানভাসে। কিন্তু তুমি কোথায় শোবে বলো তো ?

—এ ঘরে অবশ্যই নয়।

—কেন, আমি কি অজগর !

—উরি, বাপ্‌রে ! অজগরেও রক্ষে ছিল। পদ্য রচনা করা হয় অর্থাৎ পোয়েট। আমাদের ইংলিশের ম্যাডাম সাবধান কোরে দিয়ে বারবার বলেছেন, কবিদের ভালোবাসতে না পারলে ওদের বেশি সময় দিও না। মেয়েরা নাকি কবিদের চোখে এমন এক ধরণের ক্যাকটাস যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তাক্ত হতে না পারলে নাকি পদ্য লিখিয়েরা তৃপ্ত হয়না।

— ম্যাডামটি এমন দিব্যজ্ঞান কোথায় পেয়েছেন জানি না, তবে কবি

না-হয়েও রক্তাক্ত হবার ইচ্ছেটাকে সামলাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তুমি বরং বাইরে দাঁড়িয়ে রাত্রি জাগো কিম্বা অন্য কোন ঘরে যাও। অধিকার যখন দিয়েছই, এ-বিছানাটা আজ রাত্রে আর ছাড়ছিনা।

—আলোটা জ্বলবে, না নিভোবো ?

কিছু বলতে পারলাম না মুখে। পর্ণা ভাবতে পারে ওর কথা আমি শুনিনি। বস্তুতঃ আলো জ্বলা বা নিভে যাওয়া দুটো ব্যাপারই অন্ততঃ এই মুহূর্তে অর্থহীন। কারণ, আমার বন্ধ চোখের অন্য গোচরতায় পর্ণার বালিশজুড়ে তরুণ এক গন্ধ। অন্তর্গত। ভীষণ রকম তাজা এবং অভিজাত একটা গন্ধ জড়ানো বালিশের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছি মুখ। বালিশটা পর্ণার। প্রতিরাত্রে এই বিছানাতেই একটা করে বয়সের পাঁপড়ি খুলেখুলে পর্ণা ধীরে ধীরে যুবতী হচ্ছে। আজ সেই ছড়ানো পাঁপড়ির মধ্যে আমিও ডুবিয়ে ফেলছি একটি পুরুষাকৃতি শব। কৃত্রিম আলো নেভানোর শব্দ হল। শব্দ হল দরজা ভাঁজের। আর আমার চৈতন্যে অন্ধকার সেই ঘর, বিছানায় নেচে উঠল অপরূপ এক জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় কম্পমান বাঁকুড়ার ধু ধু করা লাল মোরাম। মোরাম ফাটিয়ে জেগে ওঠা আকাশ সমান মাটির ঘোড়া আর ঘোড়ার পিঠে চেপে আমি যেন লাফাতে লাফাতে দৌড়ে দৌড়ে চলেছি অজানা এক ভোরের অরণ্যে। সারা গায়ে হুহু করা বাতাসে উড়ে আসা ছেঁড়া পাতা, শুক্‌ণ মুকুল কোন বৃক্ষসারির। আর অপূর্ব এক টিলার মাথায় পর্ণা না জয়তী— কে যেন রুমাল উড়িয়ে ক্রমেই দ্রুত করতে বলছে পর্যটন।

আট.

ঘুম ভাঙালো পূর্ণিমা। চোখ মেলেই এক যুগলদর্শন। চোখের পিচুটি মুছতে মুছতেই ভেবে নিলাম দিনটা আজ ভালোই কাটবে। এমন রমণীয় দুটো উষ্ণ মুখ একসাথে প্রায়শই চোখে পড়েনা। এই মিলনযাত্রার কাণ্ডখাতো পৃথিবীর খুব প্রাচীন এক বোধি। 'মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে / যেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে'।

এ তো রবীন্দ্র গানেও ভাস্বর। সেই প্রেমময়তার নীরব অভিব্যক্তি প্রলয়পূর্ণিমায়। এ সকাল আজ যেন বিলিয়ে দেবার। এ সকাল যেন আজ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের। মুখ ফুটে বেড়িয়ে এলো 'সুপ্রভাত'। ওরাও পাল্টা উইশ্ করল। কিন্তু দ্বিধা আমার কাটছেনা তবু। *বলা যেতে পারে ওদের ফেলে রেখে গতরাত্রে ঘুমিয়ে পড়াটাকে কেন যেন এই মুহূর্তে মেনে নিতে পারছিনা। অপ্রস্তুত লাগছে ওদের* মুখোমুখি সহজ হয়ে দাঁড়াতে। প্রলয়বাবুর পাশে পূর্ণিমা দেবীকে অনেক বেশী সপ্রতিভ লাগছে। অন্ততঃ কাল রাত্রের দেখা পূর্ণিমার চাইতেও এই সকালের আলোয় ভদ্রমহিলা অনেকটাই অন্যরকম। এতটাই আলাদা যার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আড্ডা দিতে। এক রাত্রের দূরত্বে মানুষ যে এতটা গ্রহনীয় হয়ে উঠতে পারে, এও এক অভিজ্ঞান। ওদের দুজনার মুখেই, বিশেষতঃ পূর্ণিমার মধ্যে যেন চাপা একটা উচ্ছ্বাস। বহু যত্নে যেন নিজেকে আড়াল করা হচ্ছে। সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে বসলাম। ওরাও বসল বিছানায়। পূর্ণিমার দীপ্তি অনেকাংশে উজ্জ্বল হলেও, প্রলয়বাবুর মধ্যে কোথাও কি কোন আড়াল রয়েছে! খুব সহজ যে উনি হয়ে উঠতে পেরেছেন, তেমন মনে হচ্ছেনা। পর্ণাকে মনে পড়ল। পর্ণার স্বীকারোক্তি, সংশয় এবং বেপরোয়া আকাঙ্খা। পূর্ণিমা নীরবতা ভেঙে প্রথম উচ্চারণ করল 'আজ কিন্তু আপনাকে থেকে যেতে হবে। আজকের দিনটা আমরা সবাই মিলে সেলিব্রেট করবো'। ভদ্রলোকও বলে উঠলেন 'আপনাকে আসল কথা না-বলেই পূর্ণিমা আমন্ত্রণ জানালো। বোধহয় আপনারও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, কাল রাত্রে দ্বিতীয়বার এই মহিলার কাছে আমি হেরে গেছি'। এবার মনে হল আমারও কিছু বলা দরকার। অনেকটা প্রস্তুত ভঙ্গিমায় আওড়ে গেলাম,

— হারবার আউটপুট কি, মিলন!

ঘরটা নেচে উঠল ওদের সম্মিলিত হাসিতে। হাসতে হাসতেই পূর্ণিমা বলল,

—হারটাই যদি কারো বিলাস হয়ে থাকে, তবে হারিয়ে আনন্দ তাকে

দেওয়াই যেতে পারে !

আমি কিন্তু এসব কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছি না। এখনও স্পষ্ট নয় প্রলয় মজুমদারের প্রথম হেরে যাওয়ার কারণটা কি? কিম্বা সেই অমোঘ খেলাটাতে পূর্ণিমাই বা কিভাবে জিতেছিল? মনে পড়ছে গতরাত্রে পর্ণার কান্না। কান্নার পিছনে একটা উদ্বেগ ছিল। সে উদ্বেগটা ছিল পূর্ণিমাদেবীর এই জয়ের সম্ভাবনাকে ঘিরেই। ভদ্রমহিলা যদি প্রকৃতই এই শিল্পীকে আজ এতদিন পরে, বোবাযুদ্ধ শেষে জয় করে থাকেন— আনন্দের এই ঘূর্ণাবর্তে ওই সদ্যবিকশিত তরুণীটি আবার হারিয়ে যাবেনা তো! কি বিচিত্র এই জীবন নামক ঘোর অন্ধকারে আলোর উদ্‌ভাস। কেউ দাঁড় বাইছে, দাঁড় ভেঙে কেউ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধ পাতালে। একদিন শমীকের ডিঙা প্রলয় মজুমদারকে পেছনে ফেলে, পূর্ণিমাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল উজানে। আজ আবার বাইচ-এ পাশাপাশি চলেছে আপন সন্তান পর্ণার সঙ্গে সেই পূর্ণিমারই অজ্ঞাত প্রতিযোগিতা। মেয়ে জেনেছে তার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেরই মা। কিন্তু মা কি জানে? যে পুরুষটিকে ঘিরে এই বানভাসী খেলা, সেই শিল্পীও কি জানে নীরবে এক ছায়াসহচরী কিভাবে দীর্ঘ করছে পাওয়া না পাওয়ার চরম প্রত্যাশায় গম্ভীর প্রতীক্ষা!

পর্ণাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। মিলিত এই জুটি-টির চাইতেও এখন ছায়া প্রয়োজন সেই নরম বালিকার। যার স্বপ্ন জাগরণ ঘিরে হয়ত এখন এক বিসর্জনের বিষাদ। বাধ্য হয়েই প্রশ্ন করে বসলাম,

—পর্ণাকে দেখছি না, ও' কোথায়?

– আমার ঘরে ঘুমোচ্ছে। পূর্ণিমা আরও বললেন, 'কাল যে দায়িত্ব নিয়ে আপনাকে ও' আতিথেয়তা দিতে পেরেছে, আমি তো ভাবতেই পারছিনা। আমার ধারণা ছিল 'পর্ণি' ভীষণ ইম্‌প্র্যাকটিক্যাল'।

প্রলয়বাবু হঠাৎই উঠে পড়লেন, যেন পূর্ণিমার কথা ওকে খুব বিরক্ত করছে। কিম্বা এও হতে পারে, এসব কথার থেকেও অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারলে উনি খুশী হবেন।

খুবই আকস্মিক আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন 'তা হলে আজ থাকছেন তো' ? প্রশ্নটার মত অতটা স্মার্ট উত্তর দেওয়া গেল না। বস্তুতঃ থাকাটায় বিশেষ অসুবিধে না-থাকলেও, থাকতে চাইছি না। সে ব্যাপারে খুব স্পষ্ট কোন যুক্তি সাজাতে না-পারলেও এ-কথা বলাই যায়, হয়ত পর্ণার অসহায় দুটো হাতে বন্ধুত্বের রৌদ্র পেঁৗছে দিতে না-পারার একটা সংকোচ আমাকে পীড়িত করছে। কি কোরে ওই মেয়েটির সামনে দাঁড়াব আবার! ওর প্রার্থিত পুরুষপ্রতিমার বিসর্জনের দায়ভাগী তো কিছুটা হলেও আমি হয়েই গেছি। পূর্ণিমার সঙ্গে যদি প্রলয়ের সম্পর্কটা পুনরায় নির্মিত হয়েই থাকে, আমার ভূমিকাটিও তবে অস্বীকার করবার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার নেই। কি কোরে অস্বীকার করব এ-বাড়ীতে আজ রাত্রে আমার উপস্থিতি! আর উপস্থিতিকে ঘিরেই এতসব তীব্র আলোড়ন! বরং এই মুহূর্তে এ বাড়ী ছেড়ে দূরে চলে যাওয়াটাই একান্ত কাঙ্খিত। মেয়েটির সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করাটাই বেশী উচিত। তা ছাড়াও আমার যেন হ্যাঙ-ওভার হয়ে গ্যাছে। কালকের একটা রাত্রি আমাকে অনেক দিয়েছে। এমন সঞ্চয় একটা জীবনে খুব বেশী হয়ে ওঠে বলে মনে হয়না। এখন কিছুটা নিজের মুখোমুখি বসতে চাইছি। একদম নিজের মুখোমুখি। আর সেই একাকীত্বে, সেই নৈঃশব্দে হৃদয়ের জটিল নেগেটিভে এ-বাড়ীর মানুষগুলোকে একে একে সাজিয়ে দেখতে চাইছি। যদি এখান থেকে এখুনি বেরিয়ে পড়তে না পারি, হয়ত পর্ণা নামের মেয়েটি আবার কাঁদবে, আবারও মমতার স্পর্শ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। হয়ত এবার সে নিজেকে সরিয়ে নেবে না। আড়াল করবেনা লজ্জা। বোধহয় এই মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছি না বলেই—একটা সংকোচ আমাকে এ বাড়ী থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইছে। গল্পের দূরত্বে দৌড়ে যেতে চাইছি বাইরে। এ বাড়ীর বাইরে, এ শহরের বাইরে। পর্ণার পেঁৗছতে না-পারার সীমানার ওধারে পেঁৗছনোই এখন কাঙ্খিত।

পাশাপাশি, আমার এই ভাবনাগুলোর তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতা

নাই থাকতে পারে। হয়ত পর্ণার ভূগোল জুড়ে আমার কোন সংক্ষিপ্ত রোমকূপও ছায়া ফেলেনি। হয়ত মেয়েটি নিজের মত কোরে কোন পরিণতি, পরিত্রাণের ক্যানভাস সাজাচ্ছে। এ ধরণের মেয়েরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্টই সক্ষম। হয়ত কোন নতুন ধরনের সমাধানে সে তীক্ষ্ম ক'রে তুলছে তার চিবুক। অনেক কিছু হতে পারে। এখান থেকে শুরু হতে পারে নতুন এক গল্পও। কিন্তু সেই শুরুর আগে আমার তাৎক্ষণিক যাত্রার ছেদ টেনে দিতে হবে। ফিরতে হবে এখুনই। এটা ঠিকই কোরে নিলাম, আজ এখানে থাকবো না। মনে পড়ছে কাল রাত্রে পর্ণা আমার বন্ধুত্ব চেয়েছে। মনে পড়ছে পর্ণার মা পূর্ণিমাও হয়ত এভাবেই একদিন বন্ধুত্বের আহ্বানে জড়িয়ে ফেলেছিল প্রলয় মজুমদারকে। আর এসব মনে হতেই চমকে উঠি। পর্ণার বন্ধুত্বের আহ্বানে কি কোথাও পূর্ণিমার সেই অতীত আকাঙ্খার কোন ট্র্যাজেডি জড়িয়ে আছে! শমীকের সন্তান, তার আইনানুগ স্ত্রী এই মহিলাকে পাহারা দিতে হচ্ছে এক সম্ভাবনাময় শিল্পীর। এই করুণ ঘটনাবিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতেও সেই বন্ধুত্ব। যে বন্ধুত্বকে প্রলয়বাবু হাল্কা হাতে পারেননি সরিয়ে দিতে। —এবার এক অন্তর্গত কষ্টে, সম্পর্কের জটিলতার এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রবল একটা বিরক্তি, গলা নিংড়ে বেরিয়ে আসে অস্ফুট চিৎকারে। হয়ত আচরণও হয়ে ওঠে কিছুটা অশালীন। কর্কশ উচ্চারণে প্রায় চেঁচিয়ে উঠি 'না, না,। আমার থাকা সম্ভব নয়। এখুনই যেতে হবে'। ওরাও বোধহয় কিছুটা বিস্মিত হলেন। সম্ভবত প্রলয়বাবু এরকম আচরণ আমার কাছে প্রত্যাশা করেননি। ওরা দুজন কেমন অপ্রস্তুতের মত এ ওর মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে, নিঃশব্দে হয়ত আমার পরিবর্তনের কারণ বুঝতে চাইছে। নিজেকে শুধরে নিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে এবং স্বাভাবিক সভ্যতায় ছদ্মবেশ সাজিয়ে বলি,

—আসলে, থাকতে পারলে ভালো হত। দীর্ঘদিন পর আপনাদের পারস্পারিক নিবীড় হবার এই উৎসবটাকে হয়ত আমিও এনজয়

করতে পারতাম। কিন্তু পারছি না। পারলে অন্য একসময় আবার কখনও আসব।

কথা কটা বলেই ওদের কিছু বলবার সুযোগ না-দিয়েই ব্যস্ত পায়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আর বেরিয়ে আসতেই ঠিক কাল যে-ভাবে পর্ণাকে আবিষ্কার করেছিলাম, একইভাবে আজও দেখলাম সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেওয়াল ধরে এক পরজীবি লতার মত। আজ কিন্তু আর ওর সামনে দাঁড়িয়ে, ছিন্নমূল অস্তিত্বটাকে ফিরিয়ে দিতে হলনা মানবিক আবেগ। আজ ও' নিজেই সচকিত হয়ে ওঠে। রাত্রি-জাগরণ অথবা কান্নার ক্লান্তি ঘিরে আছে দুচোখের সীমানা। মুখ-টাও নিষ্প্রভ। তবু সে আড়াল করে। আড়াল কোরে হাসতে চাইছে। হায় ছদ্মবেশ! এখনও হাসতে হয় মানুষকে। বস্তুতঃ মানুষ যে অন্য জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠত্বের বিষক্রিয়াও ততটা অরাজক হয়ে উঠেছে কারও কারও চেতনায়। যেমন এখন পর্ণাকে ইচ্ছে করছে গুলি করে মেরে ফেলি। যে মেয়েটি নিজের অধিকার হারাতে বসেছে, তাকেও যদি কেলুচরণের মত দন্তপংক্তিতে হাসি মাখাবার মহড়া সাজাতে হয় তবে তার চেয়ে অপদার্থতা পৃথিবীতে আর কি হতে পারে! কিম্বা এমনও হতে পারে—পর্ণা কোন এক দৃঢ় প্রস্তুতিকে আড়াল করছে মিথ্যে একটা মুখোশে! যাই হোক না কেন, ওর হাসবার চেষ্টাটা আমাকে কেমন সার্কাসের ভাঁড়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। নিজেই এবার প্রথম কথা বলে মেয়েটা ' আবার আসবেন তো' !

প্রশ্ন নয়, যেন এক তীর্যক শ্লেষ ছড়িয়ে আছে উচ্চারণে। যেন ও' জেনেই গ্যাছে আমি এখান থেকে পালাতে চাইছি। এ সমস্ত মুহূর্তগুলোয় নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। মনে হল কবিতা লিখিয়েদের আরও বেশি উদার হতে হয়। মনের প্রসারতা এই ভোরের মতই অবাধ হওয়া দরকার। কিন্তু এত সহজে কি ওই পুঁচকে মেয়েটির কাছে হেরে যাওয়া যায়! সুতরাং যুক্তি সাজাই। পালিয়ে যাওয়ার সপক্ষে নানাভাবে নিজেকে মহান করতে চেষ্টা

করি। যেমন প্রথমেই ভাবি ঃ সাংবাদিকদের সামনে পিছনে অনেক কিছু ফেলে রেখে ছুটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। (যদিও জানি এখনও তেমন কোন জীবিকার আঁঠায় ডানাদুটো বন্ধ হয়ে যায়নি।) তবু এই মুহূর্তে এমনই ভাবতে ভালো লাগছে। আমার এই বিহ্বলতার মাঝখানে কখন যেন প্রলয়বাবু এবং পূর্ণিমাদেবীও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এরা সবাই মিলে যেন পর্ণার প্রশ্নটার একটা স্পষ্ট জবাব চাইছে। কি আশ্চর্য সামাজিক কাঠগড়া। স্বভাবতই, খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে বলতেই হল, 'জানিনা আবার আসতে পারব কিনা পর্ণা, তবে খুব সহজে তোমাকে তোমাদের ভুলতে পারবনা এটুকু বলতেই পারি।'

হয়ত এই উত্তরটুকুর মধ্যেই আমার একচিলতে জয়! হয়ত এই উত্তরটুকুই আমার অস্তিত্বের অনিশ্চয়তার এক দাম্ভিক ঘোষণা! আহত প্রেমিকের মত এই উচ্চারণেই হয়ত ধ্বনিত হয়ে উঠল এক রক্তাক্ত অভিমান। থেকেও না থাকার মত এই শূন্যতার সাঁতারে প্রতিমুহূর্তে যে হেরে যাওয়া, সেই পরাজয় থেকে মাথা তুলে ভালোবাসার আহ্বান অস্বীকার করাটাই বোধহয় ছোট্ট এক জয়। অহংকারের পৌরুষে কেমন থিরথির কোরে কেঁপে উঠছে ধমনী। ফিরে যাওয়ার অমোঘ বাতাসে ভেসে যাচ্ছে রাত্রিবাসের এই আদর জড়ানো বাসগৃহ। ভালো লাগছে। নিজেকে যেন উদ্ধার করতে পারছি চূড়ান্ত এক ভাসমানতায়। অজান্তেই মনে মনে যেন সহস্রবার আওড়ে চলেছি 'তোমাকে ভুলব না পর্ণা, ভুলতে পারব না, ভুলতে চাইনা তোমাকে। পারলে ডেকো কখনও। তুমিও মনে রেখো—। মনে রেখো, পর্ণা— !!

নয়.

যেতে চাইলেই যাওয়া সব সময় হয় না। যাওয়া যায় না। অন্ততঃ সেই মুহূর্তে বাড়ীটা থেকে নাটকীয় প্রস্থান সম্ভব হলনা। সমস্ত আহ্বান অস্বীকার করবার পরেও সামাজিক এবং লৌকিক ভদ্রতা-বোধের ছোট্ট সন্ধিতেই প্রাতঃরাশ সেরে নেবার অনুরোধ রাখতে

হল। অত্যন্ত নিঃশব্দে সেই অধ্যায়টাও সমাপ্তির চিহ্ন এঁকে দিতেই, এবার আক্ষরিক বিদায়ের পালা। প্রলয়-পূর্ণিমার ব্যারিকেডে পায়ে-পায়ে সবুজ লনটুকু পেরিয়ে এসে বাইরের বেড়ার কাছে পৌঁছে গেলাম। গেট পেরিয়ে পেছনে তাকাতেই চোখে পড়ল হাত নেড়ে প্রবলভাবে পর্ণা ডাকছে। দূরের সমুদ্রে যেন আপ্রাণ পাল উড়িয়ে কোন জাহাজ, প্রতিহত করতে চাইছে সমূহ বিপর্যয়। প্রলয়বাবুদের কিছু বুঝতে না দিয়েই দ্রুত ফিরে এলাম পর্ণার কাছে। কিছু একান্ত উচ্চারণ শুনতে আমি যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠছি। কাছে এসে দাঁড়াতেই, পর্ণা ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলতে চাইছে বোঝা গেল। চোখ দুটো বিপন্ন। সম্ভবত এক্ষুণি গড়িয়ে ফেটে যেতে পারে শালিখের দুটো ডিম। জলে কেমন আবছা হয়ে গ্যাছে দুটো মণি। পর্ণা কিছু বলতে চাইছে। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠলেও স্পষ্ট কোন উচ্চারণ নেই। উচ্চারণ মানেই যেন কান্না। আমিও দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। কোনক্রমে নিজেকে সংহত কোরে মেয়েটির মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করবার চেষ্টায় কঁকিয়ে উঠি 'বলো পর্ণা, কি হয়েছে তোমার, বলো! কেন ডাকলে আমায়! প্লীজ, পর্ণা, কিছু বলো!' মেয়েটি হৃদয়ের এমন এক নাব্যতা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে— ঠোঁট খোলা মানেই নোনা-জলে আবছা হয়ে যাবে উপস্থিতি। তবুও সে চেষ্টা করছে। নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছে। কিছু প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। সর্বোপরি তার বলবার জন্য প্রতীক্ষা করছে ব্যস্ততম এক সময়।

আজ বেশ কিছুদিন পর সেই ব্যক্তিগত মুহূর্তটিকে বিবরিত করতে বসে সুধীন দত্তের 'শাশ্বতী' কবিতার দুটো পংক্তি মনে পড়ছে—'একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে / ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতি'। কি অব্যর্থ, কি তথ্যনিষ্ঠ আবিষ্কার মানুষের! বহু-বার পড়ে, আবৃত্তি করেও যে সময়টিকে সনাক্ত করতে পারিনি উপলব্ধির আঁচড়ে— আজ যেন পর্ণার সেই চরম বিহ্বল অবস্থাটিকে উৎসর্গ করতে পারি অমোঘ এই পংক্তি দুটো। মেয়েটি কয়েকবার কিছু বলতে চেষ্টা করল কিন্তু কণ্ঠ জড়িয়ে যাচ্ছে গোঙানির মধ্যে।

পারলো না। এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চিবুক ছুঁয়ে মাটিতে। বাঁকুড়ার মাটিতে। আর চরম অস্থিরতায় আমি যেন অসুস্থ হয়ে উঠছি। কি বলবে মেয়েটি! কি বলতে পারে সে! চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের দিকে ছুটে যাবার আগে, আলতো করে উড়িয়ে দিল 'চিঠি দেবেন'।

ব্যাস্, সামনে থেকে সরে গ্যাছে নুনের মুর্তি। সারা সকাল ঘাস মাঠ রোদ বোঝাই লক্ষ ভোমরার ডানায় যেন বেজে উঠছে 'চিঠি দেবেন ..... চিঠি দেবেন'......।

এত ছোট কথা—এত দীর্ঘ প্রত্যাশা—আমি কি পারব বহন করতে! ঘাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে, রোদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবারও ফিরছি। ফিরছি! কোথায় ফিরছি! ফেরা নেই—শুধু ছুটছি। শুধু ক্ষরিত হচ্ছি। হাত পা চুল চোখ নখ থেকে ক্ষরিত হচ্ছে পরমায়ু। ধূসর কোন দিগন্তের ইঙ্গিতে আমরা সবাই মিলে হারিয়ে ফেলছি ঠিকানা। সবাই—সবাই মিলে কিছু ধরতে চাইছি, কিছু জড়াতে চাইছি, পারছি না। প্রবল তুফান। পিছন থেকে সামনে, সামনে থেকে সম্পূর্ণতায় এক অমোঘ পরিক্রমা। ঢেউ উঠছে, তীব্র ঢেউ ভেঙে ভেঙে কুড়িয়ে নিচ্ছে অনন্ত ফসল ফসিল স্বেদ রক্ত আকাঙ্খা সাধের এক নিবিড় সমাধি। মুছে যায় সমস্ত ক্যানভাস্। পুনরায় নবতম শিল্পীর তুলি ভরে তোলে অসংখ্য ফ্রেম। —চিঠি দেবেন! কি লিখবো সে চিঠিতে! আমি ভালো আছি, তুমি ভালো থেকো! কি লিখব! আমি বেঁচে আছি, তুমিও বেঁচো। অসহায় চিৎকার মানুষের। জয়তী কিংবা পর্ণা, প্রলয় কিংবা অঙ্কুর, শমীক কিম্বা পূর্ণিমা —একই যাত্রা একই আকাঙ্খা। আকাঙ্খা সময়ক লুণ্ঠনের। হাতের পাতায় বেঁধে রাখা, চোখের পাতায়, বুকে দাঁতে তীব্রতম উন্মাদনায়, ছটফট স্ফূর্তির থাবায় নিংড়ে ফেলা সময়ের দ্যুতি। তবু তা হয়না। বেড়ে যায় একাকীত্ব, বেড়ে যায় অতৃপ্তি। অসহায় আঙুলে জড়িয়ে ওঠে ছোট্ট এক নোঙর। বালুতে কাদায় প্রায় এই সারাৎসারে অবশেষে বিশ্রাম সন্ধান। —চিঠি

দেবেন। —দেবো পর্ণা। চিঠি দেবো। চিঠিতে ছড়িয়ে দেবো অমল আত্মা। তুমি সেই আনন্দপান কোরে চিরন্তনী হতে পারো, মানবিক তৃপ্তি পাবে না।

ধীরে ধীরে গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি এর মধ্যেই। পূর্ণিমা বলল 'আপনার বন্ধুই বোধহয় বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দিচ্ছে। আমি আর যাচ্ছি না। পর্ণা বোধহয় ওদিকে কাঁদছে। ওকে একটু দেখি, কেমন! আসলে, বাড়ীতে তো তেমন কেউ আসে না, কাউকে মনের মত পেলেই কেমন দুর্বল হয়ে যায়'। মুখে কিছু না-বললেও মনে মনে চেঁচিয়ে উঠছি—হায়! মিথ্যে, মিথ্যে তুমি জননী! সন্তানকে কিছুই চেনোনি, কিছুই বোঝনি। কিচ্ছু না। বোঝা যায়না, কেবলই ভুল অহংকারে বোঝবার ভান্ থেকে যায়। ব্যর্থ হয়ে যায় উদ্ভট সঙ্ঘযাত্রা। —কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলতে পারিনা। অনেক কথাই এভাবে বলা হয়ে ওঠে না। আর এভাবেই না-বলার দূরত্বে প্রতিদিন ভারী হয়ে ওঠে একেকটা মুখোশ। ক্রমেই দু-দুটো মানুষের মধ্যবর্ত্তী নৈঃশব্দে ঘনিয়ে ওঠে এক দেওয়াল। কাঁচের দেওয়াল। ছায়া দেখে বোঝা যায়, সবই আছে। হাসছে, কথা বলছে। জীবন্ত পুতুল যেন এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে সেদিক নড়েচড়ে যৌথযাত্রার পথটাকে ভরিয়ে তুলছে জেদে। কাছাকাছি থাকবার জেদ, জীবনকে নির্মাণের জেদ। একরোখা একগুঁয়েমিতে নক্ষত্রে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের জয়ের আওয়াজ। বোঝাবুঝির কৃত্রিম চিৎকারে টাল খেতে খেতে শন্ শন্ ঘুরে চলেছে আমাদের চতুর পৃথিবী। কতকাল এমন চলবে জানি না, কিন্তু একেকটি জীবনকে ছাই হয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে যেতে হবে এমনই এক সামাজিক ক্রেমেটোরিয়ামে। পূর্ণিমা হয়ত অতীত বিস্মৃত। তিনি ভুলে গেছেন তারও এক উদ্ধত তারুণ্য ছিল। তারুণ্যে নির্মাণ ছিল বল্গাহীন ঘোড়ার সওয়ারী হয়ে মাঠ ঘাট অনন্ত নদীকে ক্ষুরের আঘাতে পেরিয়ে যাওয়ার। হ্যাঁ, ছিলো। ছিলো বলেই এক শিল্পীর মধ্যে সে আকাঙ্খার পরিত্রাণ খুঁজে ছিলো। ছিলো বলেই শিল্পীকে ছেড়ে আশ্রয় করেছিল তারই অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে পূর্ণতার সন্ধানে। এখনও যে তারুণ্য রয়েছেই

তারই প্রত্যক্ষ সাক্ষি হয়ে তো গতরাত্রে দাঁড়িয়ে ছিলাম ওদের ভুল-বোঝাবুঝির প্রশমনের আগুনে। আর সেই প্রশমনের নির্মাণ ছুঁয়েই আজ ফের ওদের মিলনমূর্ত্তি এখন আমায় বিদায় জানাচ্ছে।

কিন্তু পূর্ণিমা অতীত বিস্মৃত। সেই ফেলে আসা বয়স ছুঁয়েই আজ যে পর্ণা উড়িয়ে দিয়েছে তার গ্রীবা — এই সত্যকে সে উপলব্ধি করতে পারছে না। বুঝতে চাইছে না পর্ণার মধ্যেও আরও এক ফেলে আসা পূর্ণিমার পুনর্জন্ম হয়েছে। বোধহয় প্রলয়বাবু কিছুটা বুঝেছেন। তিনি বুঝবেন এটাই কাঙ্খিত। নইলে তার শিল্পীজন্ম ব্যর্থ। এই বোঝবার জন্যই রঙ তুলি ক্যান্‌ভাস। এই বোঝবার জন্যই তার ছবি আঁকবার প্রতীক্ষা।

জীবনকে শুধু বুঝলেই হয় না, তাকে বোঝাতেও হয়। প্রতিবেশী মানুষের মুখে মাখিয়ে দিতে হয় হৃদয়ের সেই নরম রোদ। যাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তিজীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা। শিল্পীর দায় সেই কঠিন পাথর দুহাতে ঠেলে, প্রতীক্ষিত আলোয় ধুইয়ে দেওয়া প্রজাতির মুখ। স্বজন সুজন একাকার সেই রশ্মি-বিকিরণে অজান্তেই কখন যেন ব্যক্তিগত বেদনাও আকাঙ্খার ফুল হয়ে ফোটে। বোধহয় সার্ত্রেই বলেছিলেন— Suffering is justified as soon as it becomes the raw material of beauty. আপাততঃ শিল্পীর সঙ্গেই এগিয়ে যাচ্ছি বাসস্ট্যান্ডের দিকে। আর এ পথে এগোতে এগোতেই প্রলয়-পূর্ণিমা-শমীক এপিসোডের বাকিটুকু শোনালেন সেই শিল্পী। খুব নতুন কিছু না হলেও, এদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর সেই কাহিনীর ছায়া এতটাই গভীর হয়ে রয়েছে— যার ভারে অন্ততঃ আমার দেখা দুটো চরিত্রই আজ অনেকটা ক্লান্ত। যদিও গতরাত সেই অবসাদ কিছুটা মুছিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তথাপি এই বৃত্তে পর্ণা নামক যে নতুন মুখটি সংযোজিত হয়ে গ্যাছে সেখান থেকে প্রলয়বাবু নিষ্কৃতি পাবেন বলে মনে হচ্ছে না। হয়ত নিষ্কৃতি নেই পূর্ণিমারও।

আঠেরো বছরের সম্পর্কের শীতল নৈঃশব্দে, যে অভিমান এতটা

প্রোথিত হয়ে দ্বটো হৃদয়কে প্রায় পাথরতা এনে দিয়েছে, আকাঙ্খাকে নির্বাসিত করবার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই হয়ত পর্ণার মধ্যে ম্বর্ত্ত হয়ে আজ এক বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলেছে ছোট্ট এই পরিবারটিতে। এখনও হয়ত অপ্রকাশ্য, কিন্তু প্রকাশ হতেও খ্ব বেশি দেরি হবে বলে মনে হয়না। কারণ, পর্ণা বেপরোয়া। কিছ্বতেই সে মেনে নিতে পারবে না প্রলয়-প্ব্র্ণিমার নতুন বন্ধ্বত্ব। কালকের পর্ণা কিম্বা আজ সকালের ওই অন্বচ্চার কথা, কে'দে ওঠবার মধ্যেই সেই ঝোড়ো প্ব্র্বাভাস। আমার সন্ধানের এখন একটাই বাকি। জেনে যেতে হবে শিল্পীর কাছে ওই তর্বণীটির উপস্থিতি কতটা তাৎপর্যপ্র্ণ। শিল্পীর অধিকার কি শ্বধ্ব কন্যার, নাকি প্রেরণা শক্তির ! যে ভাবেই হোক, বাঁকুড়ার মাটি ছাড়বার আগে এ প্রশ্নের সমাধান আমাকে পেতেই হবে। না-হলে পিছ্বটান আবার আমায় ফিরে আসতে প্রল্বব্ধ করতে পারে। আমার অন্ধকার নির্জনতা কাঁপিয়ে তুলতে পারে ওই বাহ্ব, ওই দ্বষ্টি, ওই কম্পমান ঠোঁটের রহস্য।

দশ.

শিল্পী বেশ কিছ্বক্ষণ বলে চলেছেন তাদের প্রথম দেখা হওয়া থেকে পরিণতির সেই গোপন ব্বত্তান্ত। শান্তিনিকেতনে প্রথম পা রাখবার পর থেকেই তার পরিবেশ— ভূ-প্রকৃতি, মান্বষজন, সবকিছ্বই কেমন তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। কলকাতার আর্ট কলেজ, শহরের ব্যস্ততা, জনজীবনের বৈচিত্র্য, সবকিছ্ব মিলেই একটা হৈ হৈ ধ্বন্ধ্ব-মার ব্যাপার। যদিও তাদের হস্টেল-লাইফটা কিছ্বটা স্বতন্ত্রই ছিল। ছবি আঁকার উপর এ-সবকিছ্বই যে প্রভাব ফেলবে সেটাই স্বাভা-বিক। চরম এক স্বেচ্ছাচারী জীবনের মাঝখানে বসে, তার ছবিও হয়ে উঠছিল অন্যরকম। প্রথম হয়ে কলেজ থেকে বেড়্বতে তার অস্ববিধে না-হলেও, ছবির জগতে যেন তখনও তার অন্বপ্রবেশ ঘটেনি। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এম্-ফাইনের স্ব্যোগও এসে গেল। কলকাতা থেকে সদ্য এসে দ্ব-একটি দিন কিছ্বটা এ্যাডজাস্ট্ করতে অস্ববিধে হলেও ধীরে ধীরে যেন রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী

নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথের স্পর্শধন্য মাটি ক্রমেই তাকে অভিভূত ক'রে তুলতে থাকল শিল্পের এক নিবীড় সান্নিধ্যে। আশেপাশের বন-বনানী, খোয়াই, কোপাইনদী, প্রান্তিকের পথ, সোনাঝুরির দীর্ঘমাথা, গোয়ালপাড়া, সবকিছু মিলেমিশে নেশার মত এক শান্তিতে ক্রমেই যেন তার শিল্পীমনটা হারিয়ে ফেলতে লাগল শহুরে কোলাহলের সেই পরিচিত ক্যান্‌ভাস। দিনরাত এখন ছবি ছবি আর ছবি। সাইকেল আর রঙ তুলি কাগজ নিয়ে হঠাৎ হঠাৎই হারিয়ে যাওয়া। কখনও পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল পাড়া, কখনও ধু ধু ধানক্ষেতের মধ্যে বাউলের একতারায় গলা মেলানো। এমনই একদিন হয়ত শীতের শুরু হবে, হুদের পাশ দিয়ে যে পথটা বল্লভপুরের দিকে গেছে তারই পাশে এবড়োখেবড়ো লালমোরামের কিনারে সোনাঝুরীর বনে বসে হাল্‌কা জলরঙে তিনি একটা ল্যান্ডস্কেপ নিতে ব্যস্ত। সোনার মত উজ্জল রোদ আসছে গাছপাতার আগল্‌ ডিঙিয়ে। ভালো লাগছে। তুলিও যেন নৈঃশব্দকে নিঙড়ে নিঙড়ে দ্রুত ভরিয়ে তুলছে বোর্ডপিনে গাঁথা তুলোট কাগজের নরম সফিনতা। আকস্মিক, খুবই আকস্মিক জঙ্গলের মধ্যে থেকেই উড়ে আসে রবীন্দ্রগানের অবার্থ কিছু শব্দ, কিছু সুর। 'যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই / চঞ্চল অন্তর / তবে ক্ষমা করো হে...'। মেয়েগলার এই সুর ছুঁয়ে শিল্পীরও যেন আচ্ছন্নতা ছিঁড়ে যায়। তুলিকে থামাতে হয়। রঙ জমে ওঠে প্যালেটে। অসমাপ্ত ক্যান্‌ভাস ছেড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন বনের মধ্যে দুটো সাইকেল স্ট্যান্ড করানো। পাশে দুটি মেয়ে বসে আছে। গাছে হেলান্‌ দিয়ে বসা মেয়েটিই বোধহয় এই ঢেউ তুলছে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে বোধহয় এইসব পরিবেশের বর্ণনা দেওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির সঙ্গে কখন যেন এক নির্জন সম্পৃক্তি গড়ে ওঠে। সচেতনভাবে বোধহয় বোঝাও যাবে না।

দামাল এক ইচ্ছে নিয়ে কাগজ রঙ ব্যাগে ভ'রে, পায়ে পায়ে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতেই মেয়েটির গান থেমে যায়। কিন্তু প্রভারবাবুর শুরু যেন সেখান থেকেই। সেই গায়িকাই আজকের পূর্ণিমা। তখন

সে ছিল বিদ্যাভবনের ছাত্রী। থাকত মৃণালিনী হস্টেলে। ইংরিজী অনার্সের শেষ বছর। দুজনার পরিচয়ের সেই প্রথম সুযোদিয়ে যে বাণী ধ্বনিত হয়েছিল সোনাঝুরির অরণ্যে, পূর্ণিমার ব্যক্তিগত প্রার্থনা কিন্তু সেই গানের মর্মকে জয় করতে পারেনি। সে ঝড়ের মতই ছুটে গিয়েছিল শিল্পীর বাল্যবন্ধু প্রতিষ্ঠিত শমীকের স্ট্যাটাসে প্রলুব্ধ হয়ে। শমীক আসত মাঝে মাঝেই প্রলয়বাবুর হস্টেলে। এঞ্জিনীয়ারিং-এর কৃতীছাত্র। পাশ করেই বিরাট মাইনের এক চাকরী। সবকিছু মিলিয়ে পূর্ণিমাকে মাতাল করে তুলেছিল নগর-জীবনের চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের এক মোহ। কিন্তু তখনও শিল্পীকে সে উপেক্ষা করতে পারছে না। পরিত্যাগ করতে পারছে না এই সমাহিত সঙ্গ। প্রলয়বাবু হয়ত বুঝেছিলেন। ইচ্ছে করেই এম্-ফাইন্ শেষ করে বেড়িয়ে পড়েছিলেন ঘোরবার অছিলায়। বস্তুতঃ ছবির ভাষাটা তো আন্তর্জাতিক ভাষা, সুতরাং শিল্পীদের পক্ষে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে গিয়েই জীবন শুরু করা সম্ভব। হয়ত পূর্ণিমাকে মুক্ত করে দিয়ে যাওয়ার তাগিদ বেশী কাজ করেছিল অবচেতনে কিম্বা অতিচেতনাতেও। এবং সেই আশংকাটাই সত্য হল। একদিন জানা গেল পূর্ণিমা শমীককে নিয়ে যৌথযাত্রা শুরু করেছে। প্রলয়বাবুও কিছুদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অতঃপর সমুদ্র পেরিয়ে পাশ্চাত্য শিল্পের স্বরূপ বুঝতে প্রথমে গেছেন ইটালী। মিলানের এক শিল্পবিদ্যালয়ের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে পরিণত করবার সুযোগ পেয়েছেন। সেখান থেকে আধুনিক শিল্পীদের স্বর্গ ফ্রান্স। প্যারিসে ভ্রমণকালে তার পরিচয় হয়েছে নামী কিছু শিল্পীর সঙ্গে। বিভিন্ন আর্ট-গ্যালারী ঘুরে পৃথিবীর বিখ্যাত সব মাস্টারপীসগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন ভালো ছবি আঁকবার সম্ভাবনায়। কথা বলতে বলতে শিল্পী যেন বারবার হারিয়ে যাচ্ছিলেন জীবনের সেইসব আনন্দ বেদনার অপূর্ব দিনগুলোতে। কত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। কখনও আশ্রয়ের তাগিদে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়ানো আর বুকজুড়ে জ্বলে থাকা নতুন কিছু করবার এক চিরন্তন আগুন।

প্রতিষ্ঠার সুযোগ তিনি বিদেশে পেয়েছিলেন। কিন্তু চোখের পাতায় এক ভারতবর্ষ— কলকাতা, শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ তিনি মুছে ফেলতে পারেননি। এর সঙ্গেই হয়ত এক গভীর বিষাদ তাকে তাড়া কোরে ফিরেছে। সে এক ব্যর্থতার স্মৃতি। পূর্ণিমার অবস্থা এক জলরঙ ক্যানভাস। প্রলয়বাবু স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না পূর্ণিমাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। ভালোবাসার মত ঐশ্বর্য পূর্ণিমার ছিল। বোধহয় ওর গান, শিল্পীকে আচ্ছন্ন করেছিল সারাটা অস্তিত্বে এবং সে গুণটি যে মহিলার আজও রয়েছে, তার পরিচয় গতরাতে আমিও পেয়েছি। যাই হোক, ফ্রান্স থেকে ফিরে কলকাতার পৈতৃক বাড়ীতেই তিনি গড়ে নিয়েছিলেন স্টুডিও। আর ওখানেই স্বাধীনভাবে যখন ছবির মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করবার কথা ভাবছেন, একদিন দিল্লী থেকে এলো শমীকের চিঠি। আমরা আগেই জেনেছি চিঠিতে শমীকবাবু ওনাকে বাঁকুড়া আসবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখানে এসেই প্রলয়বাবুর জীবনেও এলো অন্য এক বাঁক। দেখা হল পূর্ণিমার সঙ্গে। পূর্ণিমার গর্ভে সন্তান। শিক্ষকতা করছে স্থানীয় এক স্কুলে। সন্তান হল, শমীক এলো না। আর সে না-আসলে এদের ফেলে রেখে বেড়িয়ে না-যাবারও অনুরোধ জানিয়েছিলো শমীক। প্রতীক্ষা দীর্ঘ হলেও শমীকের ফিরে আসবার কোন ইঙ্গিত নেই। এমনকি দিল্লীর ঠিকানা থেকেও চিঠি ফিরে আসতে শুরু করেছে। অর্থাৎ শমীক দিল্লীতে নেই। কিন্তু একটি ব্যাপার তিনি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছেন—পূর্ণিমা যেন সহজ অধিকারেই বাঁকুড়া আসবার প্রথম দিন থেকেই শিল্পীকে জড়াতে চাইছিলো সেই পুরনো আত্মীয়তায়। এমনকি নবজাতক শিশুটিরও আধফোটা চেতনা থেকেই তাকে পরিচিত করানো হচ্ছিল পিতৃত্বের সম্বোধনে। পূর্ণিমা কখন যে তার ওপর স্বামীত্বের অধিকার অর্পণ কোরে, দাম্পত্যের পরিচয় বহন করে সামাজিক হতে শুরু করেছে সেটাও শিল্পী আবিষ্কার করেন ওদেরই এক স্কুলফাংশনে উপস্থিত হয়ে। সাময়িক হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও, বাড়ী ফিরে পূর্ণিমা স্বীকার কোরে নিয়েছিলো শমীকের অনুপস্থিতিতে

স্বামীত্বের এই পরিচয়টুকু ঋণ হিসেবেই তার কাছ থেকে সে দাবী করছে। প্রলয়বাবু এই সামান্য দানে অকৃপণ হননি। বস্তুতঃ এইসব আপেক্ষিক বাস্তবতার কোন মূল্যই তার ছবি আঁকবার জগতে নেই। সুতরাং সহজভাবেই ব্যাপারটিকে একরকম উপেক্ষাই করেছিলেন ভদ্রলোক। পাশাপাশি পূর্ণিমাপ্রবণ হয়ে উঠলেও সহজ-ভাবে গ্রহণও করতে পারেননি শমীকের স্ত্রীকে। পারেননি শিল্পী।

কেন পারেননি তার কোন অর্থবহ যুক্তি আজও তার নিজের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু গ্রহণ করতে পারেন নি— এটি একটি অসহ্যরকম সত্য। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণিমা কষ্টকর বিরক্তিতে ক্রমেই দূরে সরে গ্যাছে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তিল্‌তিল্‌ বেড়েছে দূরত্ব। শমীক তবুও ফেরেনি। এ বাড়ীতে বসে ছবি আঁকাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বহুবার চেষ্টা করেও ছবিতে ফেরাতে পারেন নি নিজেকে। বাধ্য হয়ে এখানে থাকাটাই যখন কিছুদিনের জন্য হলেও অবধারিত হয়ে উঠেছে, তখন তিনি কাজ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এখান-কারই এক সরকারী স্কুলে আর্ট-টীচারের একটি কাজও জোগাড় করে নিতে অসুবিধা হয়নি। তারপর শুধুই পড়াশুনো, চাকরী, স্বামীর ছদ্মবেশ এবং পিতার দায়ীত্বপালন। ড্রয়িং খাতায় হাল্‌কা স্কেচিং এবং প্রতীক্ষা। শমীকের ফিরে আসবার প্রতীক্ষা, ছবি আঁকবার প্রতীক্ষা। কথাপ্রসঙ্গেই প্রলয় মজুমদার আরও জানালেন— গতরাত্রেই উনি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবার পেছনে এই-ভাবে পূর্ণিমাদেবীর বেপরোয়া হয়ে ওঠবার রহস্যটা প্রথম জানতে পেরেছেন। সে যেন অন্য আরেক অধ্যায়। শান্তিনিকেতনেই অনার্স কোর্স শেষ কোরে স্নাতকোত্তর পড়াশুনোর মাঝেই শমীকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া। তারপর শিল্পী যখন বেড়িয়ে পড়েছে সেই ভূখন্ড পেরিয়ে— পূর্ণিমারও সহজ আমন্ত্রণে শমীক তাকে জড়িয়েছে মাংসে কোষে উত্তাপে। ওখানেই বি.এড কোর্স শেষ কোরে বিয়ে কোরে শমীকের সঙ্গে যখন যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে এসে তারা উঠল, কিছুদিন পর থেকেই শমীকের মধ্যে শুরু হয়েছে অন্য এক চঞ্চ-

লতা। বোধহয় পূর্ণিমার স্মৃতি থেকে প্রলয়কে মুছে ফেলতে না-পারায় ভদ্রলোক নিজের মধ্যেই ক্ষীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতই তাদের সম্পর্ক্যের মধ্যেও প্রতিদিনই বেড়ে উঠছিল প্রথাসিদ্ধ এক দূরত্ব। আর এই দাহ্যতম যাপনকে পাশ কাটাতেই মহিলা গবেষণার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। বিষয় হিসেবে এলিয়টের কবিতাকেই বেছে নিয়েছিলেন শ্রীমতি পূর্ণিমা। কলেজে পড়াবার চাকরির জন্য সে সময় হন্যে হয়ে উঠেও ব্যর্থ হতে হয়। বেশ কিছুদিন এভাবেই চলবার পর একদিন রাত্রে আর শমীকবাবু বাসায় ফিরলেন না। পরদিন একটি চিঠি পান লেটার বক্সে। চিঠিতে শমীকবাবু জানিয়েছিলেন প্রথাসিদ্ধ স্বামীত্বের অধিকার থেকে নিজেকে সরিয়ে না-নিলেও, প্রলয়বাবুর সঙ্গে মিলিত হবার অধিকার পূর্ণিমার রয়েছেই। সে ইচ্ছে করলেই শিল্পীর সঙ্গে জীবন শুরু করতে পারে। পাশাপাশি এ-কথাও চিঠিতে লেখা ছিল — আইনসঙ্গত সেপারেশনের পথে না গেলেও আপাতত শমীক দিল্লী যাচ্ছে এবং সেখান থেকে পূর্ণিমার কাছে অন্ততঃ সে আর ফিরবে না। যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটটি মহিলা যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন এবং ব্যাঙ্কেও পূর্ণিমার নামে যে অ্যাকাউন্টটি রয়েছেই সেখানেও প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠাবার দায়িত্বও শমীকবাবু স্বীকার করে নিয়েছিলেন। চিঠির সঙ্গেই একটি পেপার কাটিংও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটি ছিল বাঁকুড়ার এই স্কুল-টীচার পোস্টের একটি বিজ্ঞাপণ। পূর্ণিমাদেবী সেই ঘোলাটে সকালে সাম্প্রতিক বিপর্যয় বুঝতে পেরেই সচেতনভাবে কিম্বা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভুলবশতঃ সেই চাকরির অ্যাপ্লিকেশনে স্বামীর নাম লিখতে গিয়ে প্রলয় মজুমদারের নামটিই লিখে ফেলেন। যদিও মহিলা তখন জানতেন প্রলয় কলকাতায় ফিরেছে। কিন্তু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকার তখন সে হারিয়ে ফেলেছিল।

সৌভাগ্যবশতঃ এখানকার চাকরীটা তার হয়েও যায়। শমীকের অ্যাকাউন্ট ভাঙিয়ে বেঁচে থাকবার দুর্ভাগ্য তার হয়নি। পূর্ণিমার

কথা অনুযায়ী মানুষটার প্রতি প্রতিদিন জমে ওঠা ঘৃণায় স্বামী হিসেবে পরিচিতি দেওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই সে নিজের নামের পাশে শিল্পীর নামটিকে ব্যবহার করেছিল। অসমাপ্ত গবেষণার কাগজ, এলিয়টের কবিতা আর গর্ভে আসন্ন প্রথম সন্তানকে নিয়েই কলকাতার ঠিকানা মুছে ফেলে বাঁকুড়ার এই লাল মাটি। প্রতিদিন অল্প অল্প ক'রে বেড়ে ওঠা গর্ভের সেই ভ্রূণটার কথা ভাবতেই অভিভাবকহীনতার অসহায়ত্বে যখন মহিলার অস্তিত্ব প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে, হঠাৎই তখন প্রলয়কে নিজের বাড়িতে পেয়ে পূর্ণিমা কেমন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। প্রলয়বাবু আরও বললেন গতকাল রাত্রেই প্রথম তারা উভয়ে উভয়কে সঠিকভাবে যেন জানতে পারলেন। পূর্ণিমার প্রতি দেওয়া শমীকের চিঠির কথা যেমন জানতেন না শিল্পী, তেমনই প্রলয়ের কাছে লেখা শমীকের চিঠির প্রসঙ্গটিও মহিলার কাছে রহস্য হয়েই ছিল। কাল রাত্রে শিল্পীকে কাঁদতে দেখলেও— পূর্ণিমার কান্না নাকি আরও তীক্ষ্ণ আরও তীব্র এক অপরাধ বোধের প্রায়শ্চিত্তে প্রায় সারারাত তাকে ছটফট করিয়েছে মেঝেতে। আঠেরোটা বছরের সবগুলো দিন এক রাত্রেই যেন মুহূর্তে আছড়ে পড়েছিলো শিল্পীর ওই অগোছালো গুহায়। সে কথা বলতে বলতে শিল্পী এখনও যেন শিহরিত হয়ে উঠছেন। দু-দুটো জীবনের যাবতীয় সম্ভাবনাকে নিজেদের হাতে ধ্বংস করবার অনুশোচনা অনুতাপ যে কত তীব্র হওয়া উচিত, যে কোন স্পর্শকাতর মানুষই তাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। শিল্পীর স্বীকারোক্তি— পূর্ণিমা কাল শুধু কাঁদেইনি, হারানো দিনগুলোর ক্ষরিত বুদবুদ ছুঁয়ে জ্বলে ওঠা একটা চিতায় সে মুহুর্মুহু দগ্ধ হয়েছে। তার সেই আর্তির মধ্যে যেমন ছাই হয়ে যাবার কষ্ট ছিল, তেমনই ছিল এক পুনর্জাগরণ। পূর্ণিমাকে কাল কথা দিতে হয়েছে তিনি ছবি আঁকা শুরু করবেন এবং প্রলয় মজুমদার পৃথিবীতে বাঁচবে শুধু ছবিরই জন্য। শিল্পী এক আশার কথাও শুনোলেন। গতরাত্রেই পূর্ণিমার মধ্যে প্রথম সাবজেক্টও তিনি পেয়ে গ্যাছেন। সম্ভাব্য টাইটেলটাও শুনিয়ে দিলেন 'ফুনার‍্যাল'। শবদাহ। উৎসাহিত হয়ে

জানতে চাইলাম কলকাতায় তার স্টুডিওটা এখনও আছে কিনা। ভদ্রলোক জানালেন, আছে। খুব অস্থির লাগলে ওখানেই ছুটে গিয়ে দু-একটি দিন তিনি জিরিয়ে আসেন। ফেরবার পথে শান্তিনিকেতনে নামতেও তার ভুল হয় না। যেন এই দুটো তীর্থ ছুঁয়েই এখনও তার বেঁচে থাকা। তেমনই এক ভ্রমণের পথেই বোলপুর স্ট্যান্ডে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গতকাল দুপুরে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওই দুপুরটাকে আর গতকাল বলতে পারছি না। আমারও যেন মনে হচ্ছে গতজন্মের দূরত্বে পৌঁছে গ্যাছে সেই সাক্ষাৎ। পরের প্রশ্নটা খুব আকস্মিকই ক'রে বসলাম, 'স্কুলের চাকরীটা কি এখনও রাখবেন'? প্রশ্নটায় বিব্রত হয়ে উঠলেন প্রলয়বাবু। সম্ভবতঃ পূর্ণিমাকে কথা দেবার পর থেকে এই একই প্রশ্নে তিনি পীড়িত হচ্ছেন বেশী। কারণ, ছবি আঁকবার সঙ্গে এই চাকরীর সম্পর্কটা দুটি ভিন্নতম মেরুর। একটিকে রেখে অন্যটিতে নিজেকে ডিভোট করা একেবারেই সম্ভব নয়। এবং সম্ভব হওয়া উচিতও নয়। একটি নিয়মতান্ত্রিক জীবিকার মধ্যে বসে অন্য এক স্বাধীন অভিব্যক্তির আকাশকে প্রশ্রয় দিতে গেলে প্রতি মুহূর্তেই আপোষ আসবে। আর আপোষেই শিল্পী একসময় হারিয়ে ফেলবে লড়াই করবার মত মেরুদন্ডের শক্তি। হয়ত এই জন্যেই শিল্পের ইতিহাসে কোথাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি ছবি আঁকা এবং অন্য এক জীবিকার সম্মিলন। বরং দুটো একটা ছবি বিক্রী ক'রে বেঁচে থাকবার মত পরিচিতি এবং দক্ষতা নিজের রয়েছে— সে কথাটাও ভদ্রলোক স্বীকার কোরে নিলেন। কাজেই এখন স্থির করতে হবে এই পরিবারটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কোন্ সুতোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই আবিষ্কারের তাৎপর্য্য বিচার করেই নিতে হবে সিদ্ধান্ত।

ভালোবাসবার অধিকার কাল রাত্রে যেমন পূর্ণিমা অর্জন করেছে, ঠিক একইভাবে শিল্পীও পেয়ে গ্যাছেন ছবি আঁকবার স্বাধীনতা। এখন কোন্‌টিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে কিম্বা দুটোকেই বজায় রেখে পথে পা বাড়ানো যায় কিনা, পূর্ণিমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বসে সে বিষয়ে ঠিক ক'রে নেবেন প্রলয়বাবু। তবে এটা তিনি স্বীকার কর-

লেনই, যে কোনও একটিকে বেশী প্রাধান্য দিলে অন্যটির বাঁধন কিছুটা যে শিথীল হবেই, প্রাকৃতিক এই সত্যটি মেনে নিতেই হবে। এ-যেন মানুষের এক চিরন্তন বোধের উচ্চারণ— 'একটিকে পেতে গেলে, অন্যটিকে হারাতে হবে।' আর এখানেই যেন পেয়ে গেলাম পর্ণার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার শিল্পীর এক অবচেতনের সমর্থন। প্রকৃত শিল্পীর কাছে তার নিজস্ব সৃষ্টির জগৎ ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক্য অন্য কোন সামাজিক বিধিনিষেধ সব কিছুই অসহায়ভাবে গৌণ। বেশীরভাগ সময়েই ভীষণরকম উপেক্ষিতও হয়ে ওঠে। পূর্ণিমাকে পুনর্বার ভালবাসার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ, অবশ্যই বেড়ালছানার মত তার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ানো নয়। ওই বিশেষ একটি নারী অবয়বের মধ্যে সামগ্রিক শিল্পচেতনাকে বেঁধে রাখা তো হতেই পারে না। পরিবর্তমান জীবনস্রোতের ঢেউয়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনন্ত বস্তুপ্রতীমা ভেসে উঠছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে অসীমে। অনন্তকালের ওই প্রাণময় বিমূর্ত্ত-বস্তুসত্ত্বাই তো শিল্পের স্পর্শমুখী ভূমি। সেখানে বিশেষ এক মূর্ত্তবস্তুর অস্তিত্ব সর্বতোভাবেই ক্ষণস্থায়ী। শিল্পীর কাছে, ব্যক্তিজীবনের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারও একই কারণে প্রায়শই রক্ষিত হয়না। তেমনটি প্রত্যাশা করাও অমানবিক। সুন্দর যার ধ্যান, প্রাত্যাহিক নির্মাণের বস্তু—তার কাছে পৃথিবী, এমনকি মহাবিশ্বের প্রত্যান্ত অন্ধকার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যে কোন ছোট্ট আলোকবিন্দুও আহরণের আগ্রহে উজ্বল। পর্ণা কিম্বা পূর্ণিমা, দুজনের মধ্যেই, তাৎক্ষণিক মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে সুন্দরের সেই আনন্দতিলক। দুজনের যে কেউই মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে শিল্পীর অগোচর দৃষ্টির কোন এক মানস প্রতিমায়। বস্তুতঃ প্রলয় মজুমদার কোন্ পথে হাঁটবেন, সেটাই আমাদের দেখবার। পারিবারিক পিতা কিম্বা স্বামীত্বের বাঁধন যদি তীব্র হয়ে ওঠে, তবে একজন সাধারণ মানুষের বিচারেই যেমন তাকে আমরা গ্রহণ করতে চাইব তেমনই যদি শিল্পের জগতে তিনি পা রাখেন, তবে একজন শিল্পী হিসেবেই তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

গতকাল এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে একটা প্রশ্ন কিছুতেই শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে পারছি না। একজন মনে-প্রাণে শিল্পী মানুষ এবং যার ক্যারিয়ারও প্রতিশ্রুতিবান শিল্পী হওয়ার অনুকূলেই ছিল, তিনি সেই নিজস্ব ভূমি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে সাধারণ একটা কথা রাখবার অছিলায় কেন জড়িয়ে আছেন জীবনের অন্য একটা বৃত্তে? যে বৃত্তে শিল্পের প্রকাশ সে-ভাবে প্রকট হয়ে উঠতে পারছে না, সেখানে কেন তার এই অজ্ঞাত-বাস! কিছুতেই বুঝতে পারছি না মানুষ তার প্রকৃতিকে এভাবে ভুলে থাকতে কিম্বা নিজস্ব বৈশিষ্টকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে কিভাবে! কিভাবে এই স্বেচ্ছা নির্বাসনেও মানুষ বেঁচে থাকবার শক্তি অর্জন করতে পারে! কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না সমাধান। অনেক শুনলাম দেখলাম জানলামও অনেকটাই তবু প্রলয়বাবুকে ঘিরে বেড়ে ওঠা প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। যে মানুষ ছবি আঁকবার জন্যই দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ালেন, নিজের ভালবাসাকেও আলগোছে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেরই বন্ধুর হাতে— সেই রঙ তুলি ক্যানভাস ছেড়ে বন্ধুরই পরিত্যক্ত এক মেয়েমানুষকে অতীত পরিচয়ের সূত্রে কেবল পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন। আর অকাট্য এক যুক্তির আড়ালে নিজেকে আশ্বস্ত করছেন এই বলে যে, বন্ধুর ফিরে আসাটাই ছবির কাছে তার ফিরবারও উপযুক্ত সময়। এ এক নিদারুণ রহস্য। এ ধরণের অদ্ভূত মানসিকতার সঙ্গে আগে কখনও পরিচিত হইনি। বইতে পড়লেও হয়ত অবিশ্বাস্য বলে পাশে সরিয়ে রাখতাম। প্রশ্নটা এবার সরাসরি শিল্পীকেই ক'রে বসলাম। উনি খুব যত্ন নিয়ে প্রশ্নটা শুনলেন। ততোধিক যত্নে একটা চারমিনারের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার কোরে একটা আমায় দিলেন, নিজে জ্বালালেন একটা। তারপর কিছুটা লজ্জিত হয়েই বললেন—

— সমস্ত মানুষেরই একটা সংস্কার থাকে মানেন তো! আমি সু অথবা কু-সংস্কারের কথা বলছি না। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ধরণের মানসিক দুর্বলতা। কেউ সচেতনভাবে এই দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি পেলেও আরও এক নতুনতম সংস্কারের

শিকার হয়ে পড়ে। এবং এই দুর্বলতা যে সবসময় ধ্বংসাত্মক সেটাও বলা যায় না। এই দুর্বলতা অনেক সময় নির্মাণেও সাহায্য করে। এই ধরণের মানসিক দুর্বলতাকেই যদি কোন যৌক্তিক ভূমির ওপর দাঁড় করানো যায়, তবে সেটাকেই হয়ত 'বিশ্বাস' নামে আমরা মেনে নিই। যাই হোক, এ সবের ব্যাখ্যা হয়ত মনস্তাত্ত্বিকেরাই ভালো দিতে পারবেন। তবে এই সংস্কার দু-একটি করে সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। এটা আমি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। অসুবিধে হল, সৃষ্টিশীল মানুষেরা বাস্তবতার এমন এক জটিলতম স্তর থেকে তাদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটায় যেখানে যুক্তির জগতটাও সাধারণ মানুষের যুক্তিপরম্পরার বোধগম্য জগতের থেকে অনেকটাই অন্য-রকম। স্বভাবতই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখা জাগতিক সত্যমিথ্যাগুলো উপলব্ধির চোখে এসে এলোমেলো হয়ে যায়। বিখ্যাত চিত্রকর পল্ গঁগ্যার একটা অসাধারণ উচ্চারণ ছিলো— *I SHUT MY EYES IN ORDER TO SEE*. বোধহয় বুঝতে পারছেন ব্যাখ্যাতীত এক আবেশের মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্মতম কিম্বা একেবারেই উপেক্ষিত বিষয়-গুলোও কখন যেন অসাধারণ ভারী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় অস্তিত্বের মুখোমুখি।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে শিল্পী যেন কিছুটা হাঁফিয়ে উঠ-লেন। তাকে কিছুটা দম নেবার সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যেই বলে বসলাম—

— ও' হেনরীর 'লাস্ট লীফ্' গল্পে সম্ভবতঃ এধরণেরই এক সংস্কা-রের কথা বলা হয়েছে। অসুস্থ একজন মহিলা ভেবেই নিয়েছিলেন, সামনের জানালায় ঝুলে থাকা লতানো গাছটির শেষ পাতাটি যতক্ষণ বোঁটায় ঝুলবে ততক্ষণই তার নিজেরও বেঁচে থাকা।

— হ্যাঁ, গল্পটা আমিও জানি।

— কিন্তু ট্র্যাজেডিটা একবার ভাবুন— মহিলাকে সেই অলৌকিক আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিতে একজন শিল্পীর আত্মোৎসর্গ কি নির্মম!

— মনে আছে। ঝড় জল উপেক্ষা ক'রে কৃত্রিম পাতা এঁকে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন লতানো সেই গাছে যেন সে পাতা ঝরে না যায় দ্রুত।

[illegible] রক্ষা পায় [illegible] ভিতরে [illegible] কিন্তু [illegible]
[illegible] —
[illegible] দিয়েছে [illegible]
— [illegible] অসমসরল হলেও [illegible] করতে যাওয়ার কারণ
পরিণতিটা কিন্তু অসহনীয় ॥ [illegible]
— হাঁ, মানছি অসহনীয়, তবু [illegible] মুক্তি [illegible]ও
একটা জীবনে প্রায়ই [illegible] — আমাকেই দেখুন না,
এতটা লিবারাল হয়েও, এত বিচিত্র [illegible] ঘুরেও
'কথা দিলে কথা যে রাখতে হয়' এমন একটি [illegible] থেকে
আজ আঠেরোটা বছরেও [illegible] পাইনি। [illegible]
এই রোবট সভ্যতায় সাধারণ [illegible] কতটুকু ! কত
অনন্ত প্রতিশ্রুতি প্রতি [illegible] দিয়ে আর পর-
মুহূর্তেই ভুলে যাচ্ছে নিজের অহংকারে। [illegible] তো [illegible]
করা উচিৎ ছিল, কিন্তু পারিনি। [illegible] না পারাটা [illegible]
কথা দিয়ে ভুলতে না পারাটাই তো দুর্বলতা। [illegible]
কাছেও অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে [illegible] সেই জন্যই [illegible]
কথা। সেইজন্যই বারবার আপনার মনে হচ্ছে, আমার এই [illegible]
খানো কথা রাখবার আড়ালে [illegible] কোন মিথ্যাচারিতা [illegible]
রহস্যের [illegible] একটা [illegible] উত্তর খুঁজে পেতে আমি [illegible]
হয়ে উঠেছেন। আমি কি খুব মিথ্যে বলছি [illegible]! আপনি
কি এখনও মনে করেন না, আমার এই সংস্কারটি খুবই ধ্বংসা[illegible]

[illegible]
[illegible] কখন থেমে গেছে আমার পা। [illegible] চাকার [illegible]
সেই [illegible] হয়ে [illegible] আকস্মিক [illegible]। প্রায় [illegible]
কথাগুলোর তীর যেন অস্থিগ্রন্থি [illegible] করে [illegible]
[illegible] এক [illegible]। ছিঃ, কি নীচ আমরা। কত [illegible]
[illegible]। নিজেদের সীমাবদ্ধতা দিয়ে বিচার
অন্য মানুষকে। যোগ্য জবাব দিয়েছেন
[illegible]
শিল্পী। শুধু জবাব নয়, হীন মানসিকতা, জঘন্য সন্দিগ্ধতার মুখে

। স্পষ্ট এক ব্যাপার। এত স্পষ্ট একটা প্রতিবাদ। কত বিদ্রোহের সঙ্গে অভিব্যক্ত করলেন ভদ্রলোক। প্রতিবাদ আজকের সামাজিক মিথ্যাচা-রীতার বিরুদ্ধে। যে সময়ে আমরা বাঁচছি, এই সময়ের মেক-ই হচ্ছে হঠকারীতা। কথা দিয়ে কথা না-রাখাটাই সাময়িক সভ্যতার মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। প্রতিদিন চারপাশের ধাপ্পাবাজ, ধান্দাবাজ, ধর্মকামী কেরানীবিলাসের মাঝখানে, সত্যকে হত্যা কোরে নিজের মুখোশ এঁটে রাজপথ কাঁপিয়ে যাওয়াটাই মানুষের সহজাত ধর্ম বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে— তখন প্রলয়বাবুদের সত্যের প্রতি এই নিষ্ঠাকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে এটাও খুবই স্বাভাবিক। কি কোরে মেনে নেব, বন্ধুকে দেওয়া সাধারণ একটি কথা রাখবার তাগিদে একজন মানুষ সাধ স্বপ্ন আকাঙ্খার বুকে পাথর চাপিয়ে নিরন্তর বয়ে বেড়াচ্ছে আরোপিত দায়বদ্ধতার এক ভঙ্গুর চিবুক! নিষ্ঠাহীন অন্ধকারের ভাসান ই যখন আমাদের প্রথম আকাঙ্খা, তখন তারই পাশে দাঁড়িয়ে অন্যমানুষের নৈতিক অধ্যবসায় মেনে নিতে অসুবিধে হবেই। কিন্তু শিল্পী যেহেতু সত্যে নিষ্ঠ, খুব স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে যেটা স্বাভাবিক, আমাদের চোখে সেটা অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে।— তবুও বলছি, অন্ততঃ সেইমুহূর্তে আপন মনে শপথের মত উচ্চারণ করেছি, এমনই অনন্ত সংস্কারে শৃঙ্খলিত হয়ে যাক মানুষের অযুত মিছিল! অন্ততঃ এইসব মানবিক মূল্য-বোধগুলোর আলোতে মুখ রেখেই মানুষ সৃজন করুক নিজস্ব
!

ইচ্ছে করল প্রলয়বাবুকে একটা প্রণাম করতে। কেন জানি না অজান্তেই মানুষের এইসব মহত্ত্বের কাছে নম্র হওয়ার সাধ জাগে। নত হতে ইচ্ছে হয়। সুযোগ পাওয়া যায় খুব কমই। কোন কথা না-বলেই বিনম্র নামিয়ে এনেছি মাথা। প্রলয়বাবু বিদ্যুৎ চমকের মত কুড়িয়ে তুললেন বাহুতে। ছোট্ট ক'রে বললেন 'BE A MAN FRIEND!' কথাটা ছোট, কিন্তু সেই বাসস্ট্যাণ্ডের মুখে অনেক মানুষের ব্যস্ত রাস্তার পাশেও তার অনুরণন যেন কাঁপিয়ে দিল সমস্ত

মানুষ জননী। মুহূর্তেই মিলে মনে হল পারিপার্শ্বিক জীবনের এত কোলাহল। সব রয়েছে জীবিত। পথ ঘাট প্রকৃতি বিজ্ঞান শিল্প কৃষ্টি গ্রন্থ। কেবল মানুষের মধ্যকার যেন ক্রমে যাচ্ছে পৃথিবীতে। দুর্গাময় ভূস্বর্গ থেকে সভ্যতাই যেন সর্বস্বান্ত হয়ে উঠেছে সভ্যতার সকল অহংকার। যে বোধ কেবল মানুষের কাছেই পাওয়া সম্ভব, সেটিরই অভাব সব থেকে বেশী। তাই প্রবাহমান জনস্রোতকে অনন্তশক্ত লাগছে। তার এই ক্ষতস্থানের কাছে অবনত হওয়ার আকাঙ্খা থেকেই শিল্পী মানুষটি ফিরিয়ে দিলেন আমার হুঁশ। তার উচ্চারণ আমার স্মৃতিকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, মানুষের ধর্মই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এই মানবিক আচরণ মানুষের কাছেই প্রত্যাশিত, বিশেষভাবে সম্মান জানিয়ে তাকে বিশেষায়িত করার প্রয়োজনের চাইতেও জরুরী হয়ে উঠেছে মানুষ হয়ে ওঠার প্রয়োজন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার প্রতিশ্রুত দায়বোধ।— মনে রাখব বন্ধু, মনে রাখবার চেষ্টা করব। বয়সের সীমারেখা উড়িয়ে এই যে গ্রহণ, এই যে আকর্ষণ, এই স্মৃতি-জাগরণ মনে রাখতে চেষ্টা করব। Be a man friend. Be a man...

বারো।

বাস ছাড়তে এখনও দেরী আছে। জায়গাটা রেখে নেমে এসে দেখলাম শিল্পী তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আধঘন্টা পরে বাস ছাড়বে। প্রণববাবুই ডেকে নিয়ে সামনের এক চায়ের দোকানে বসালেন। কাঁধের ঝোলাটা থেকে একটা ছোট ডাইরী বার কোরে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিকানাটা লিখে দিন। বললাম, পার্স কাছে আছে। উনি ফের বললেন, আমার ঠিকানা রাখবেন না! লজ্জিত হয়ে ডাইরী বার কোরে লিখে ফেললাম দুটো ঠিকানা। বাঁকুড়া এবং কলকাতা— দুটো ঠিকানা দিতে উনি নিজেই বললেন, 'সামনের কয়েকটা দিনের মধ্যে কোনটা আমার ঠিকানা হবে জানিনা, তবে নতুন বাঁক কোনদিকে নেওয়া হবে জানাব। আর এটা আপনাকে জানাব আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ'। শেষের কথাটা কানে পৌঁ

করে উঠতেই প্রতিবাদ করতে গেলাম। উনি তার আগেই সামলে নিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু ... সূত্রে এই বাড়ীটিতে আপনার উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারেন না। আর আপনি যদি সেটা না পারেন, ... রাখি ... আত্মীয় পাওয়ার বোঝা যেভাবে উপচে উঠেছে সেই প্রাপ্তির পিছনে আপনার প্রত্যক্ষ সংযোগের কথা অস্বীকার করতেও আমার সংকোচ বোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক'। আর সেই-জন্যেই আপনাকে ভুলে যাওয়াটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং আপনারও ভোলা উচিত নয়— যে মানুষটিকে আপনি জীবন ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন, ... কথা। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এবং বেঁচে থাকবার বাকি দিনগুলো আপনার কাছে সচেতন ভাবে কৃতজ্ঞ থাকতে চাইছি'।

ভদ্রলোকের কথাগুলো সত্য হলেও সহ্য করতে পারছিলাম না। সিগারেট কেনবার অজুহাতে উঠে পড়তে চাইলেও আবারও উনি থামিয়ে দিয়ে বললেন 'কোথায় যাচ্ছেন'? সিগারেটের কথা বলতেই বললেন ঐ দোকানেই আছে, যেতে হবে না। অতঃপর কথাহীনতার মাঝখানে চা এলো। কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়েই দেখলাম ভদ্রলোক ডাইরীর ভাজ থেকে কিছু বার করছেন। উৎসাহের সঙ্গে আমিও প্রতীক্ষা করছি নতুন কিছু জানবার। মাথায় আবার সেই প্রশ্নটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশা সম্পর্কিত সঠিক তথ্যটি নিয়ে না ফিরলে জানাটা যে অসম্পূর্ণ থাকবে সেই কথাটা ভুলতে পারছি না। কিন্তু এই মুহূর্তে ভদ্রলোককে আর বিব্রত করতে ইচ্ছে করছে না। হয়ত ওনার মানসিক উচ্চতার কাছে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে আরও একবার প্রকাশ করে না-ফেলবার দ্বিধায় কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে আছি! উনি একটি এনভেলপের আড়াল থেকে একটি চিঠি বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'অনেকটাই যখন জানলেন এটুকুও জেনে যান। এটি শমীকের সেই চিঠি। একবার পড়ে নিন। বোধহয় আপনাকে না নিয়ে বাস এর মধ্যে ছেড়ে যাবে না'। দামী দুধসাদা কাগজের বুকে কালো কালির স্পষ্ট অক্ষরে মুক্তোর মত গেঁথে রাখা হয়েছে কিছু শব্দ। এ-ধরণের চিঠি যে কেউ হাতে পেলেই অ্যালবামে তুলে

রাখবে এটুকু বলাই যায়। শিল্পীর কাছে গুরুত্ব পাবার কারণ যে রয়েছেই সে তো আমরা জেনেই গেছি। যতদূর মনে পড়ছে চিঠির শব্দগুলো এইরকম ছিলো—

প্রিয় প্রলয়,

তোমার কাছে খুব বেশী কিছু কখনও চাইনি। কিন্তু দিয়েছো। না চাইতেই ছেড়ে দিয়ে গ্যাছো নিজের ভালোবাসাকেও। আমি ঋণী। কখনও পরিশোধ হবে কিনা জানিনা, তবু স্বীকার করছি এই ঋণ।

সম্ভবতঃ এই প্রথম হাত বাড়িয়ে তোমার সহযোগিতা চাইছি। পূর্ণিমা বাঁকুড়া গ্যাছে। ওখানেই থাকতে হবে ওকে। ও মা হতে চলেছে। পারলে কিছুদিন যদি ওকে তোমার প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বে রাখা সম্ভব হয়, আমি কৃতজ্ঞ থাকব। যদি সহযোগিতার এই প্রস্তাব গ্রহণ করো, নীচে ঠিকানা রইলো— আমি ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত পূর্ণিমার আশ্রয় তুমি ছেড়ে আসবে না, তেমনই চাইছি। অন্ততঃ ছোট্ট একটি দ্রুততম বার্তায় আমাকে জানাও এ-প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করলে কি না!

ভালোবাসা— শুভেচ্ছায়—
বন্ধু শমীক

চিঠি থেকে চোখ তুলে নিতেই দেখি প্রলয়বাবু কিছু বলতে চাইছেন এবং খুবই ছোট করে বললেন—

— টেলিগ্রামে জানিয়েছিলাম ' I accept your challenge. '

কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র বেজে উঠল বাসের হর্ন। করমর্দনেও ভুল হয় নি। হয়ত আমার দৃষ্টিজুড়ে তখনও জড়িয়ে আছে অন্য এক জিজ্ঞাসা। শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায়নি। বাসে উঠিয়ে দিয়ে বললেন ' পর্ণা-কে চিঠি দেবেন তো '! কথাটায় যেটুকু বলা হল, যেটুকু হল না, সবটা মিলেই যেন এক অসমাপ্ত কথার প্রতীক্ষা। উনি কি করে জানলেন পর্ণার শেষ কথাগুলো, কিম্বা পর্ণার কথা দিয়েই বা কেন আমাদের সাক্ষাতের আপাত সমাপ্তি টানতে চাইলেন! ভীড় আমাকে সীটের দিকে এগিয়ে দিলো। পিছন ফিরে দেখাও হল না শিল্পীর

চোখেমুখে কোন্ আলো! জানালা দিয়েও চোখে পড়ল না ভদ্রলোকের উপস্থিতি। কিন্তু আমি চাইছিলাম, অন্ততঃ একবার ভীষণ ভাবে চাইছিলাম ওনার মুখোমুখি দাঁড়াতে। আমি কি সত্যিই আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি! সত্যিই কি এখনও জানা হয় নি প্রলয়বাবুর কাছে ওই তরুণীর অস্তিত্ব কতটুকু! নিজের জীবনের সবগুলো পৃষ্ঠা আমার চোখের সামনে মেলে ধরবার পরেও যে প্রশ্ন জড়িয়ে উনি আমায় বাসে তুলে দিলেন, ছুঁড়ে দিলেন যাত্রীর মিছিলে— সেই বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্নে কি কোথাও কেঁপে ওঠে নি ভদ্রলোকের গোপন পাঁজর, নিভৃত নিঃসঙ্গতা, লৌকিক বেড়ার এধারে ছটফট স্নায়ুমূল, ঘুমযুদ্ধ এবং বিন্যস্ত দৃশ্যের এক অলৌকিক স্পর্শমন্ডল! কি করে হয়! কি করে গোপন বেদনা তবে গান হয়, কবিতা হয়, শিল্প হয়ে ওঠে! বস্তুতঃ শিল্পীর ইঙ্গিতের মধ্যে কন্যার প্রতি পিতার দায়বদ্ধতার কোন স্পষ্ট অভিনিবেশ ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি। কোন পিতা, কন্যার অন্তর্গত উচ্চারণকে এতটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে কোনদিনও সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারবে না, পারা উচিত নয়। কোন পিতাই অনুরোধের আড়ালে এভাবে জানিয়ে দিতে পারবে না কন্যার গভীর উৎকণ্ঠার অন্তর্গত আর্তি। উচ্চারিত না-হলেও যে অমোঘ আকাঙ্খা চিৎকৃত হওয়া দরকার ছিল আমার আর পর্ণার শেষ সাক্ষাতে— সেই গোপনতাকে পিতা কোনদিন বুঝবে না বলেই প্রয়োজন হয়েছে প্রেমিকের। কন্যার অবচেতনে যে সুপ্ত বেদনা পলে পলে জমে ওঠে প্রতিটি ক্ষরণ প্রতিটি পুনর্জাগরণে, সে বেদনা সঞ্চিত থাকে অন্য এক পুরুষ প্রার্থনায়। সে পুরুষ পিতা নয়, ভ্রাতা নয়, অন্বিষ্ট আত্মার মতই সত্য অন্য এক প্রেমিকের মুখ। আর যদি পিতা, কন্যার সেই অবচেতনের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়— আমরা তার পিতৃত্ব লুণ্ঠন করে নিমেষেই প্রেমিকের মুকুটচূড়ায় তাকে অভিষিক্ত করব। সামাজিক নিয়ম এমনই, সভ্যতার এই অজুহাতেই প্রজন্মের পায়ে পায়ে দীর্ঘ হয়ে চলেছে মানুষের যাত্রা। দীর্ঘ হয়েছে পশুজীবন ঘুচিয়ে মানবিক বোধের এক শ্রেষ্ঠতম জন্তুজন্ম। আপাতত আমি প্রায় নিশ্চিত হতে চলেছি এই ভেবে যে,

প্রলয় মজুমদারের প্রেরণাশক্তির নোঙর গেঁথে গ্যাছে পর্ণার রূপ-অবয়বে। যেন দীর্ঘ এক ক্যানভাসের সামনে বসে রঙতুলি হাতে আমিও নির্মাণ করছি মহান এক মাস্টারপীস্। পর্ণার সার্থক আগুন সঠিক মশাল ছুঁয়ে জ্বলে উঠেছে সারাৎসার আঁধারময়তায়। প্রলয় মজুমদারও হয়ত ভুল করেননি নিবিড় গ্রহণে। জানি না এর শেষে কি আছে, জানি না এই পথ কতদূর ছোটাবে ওদের! প্রতিকুলতা অনেক, অনুকূল শুধু একটিই যুক্তি— শিল্পীর তুলি প্রকৃত অগ্নিতেই নির্বাণ খোঁজে। ওদের পরিত্রাণ, ওদের নির্বাণ অর্থময় এক সৃজনকে ব্যপ্ত করুক মানবিক অহংকারে। সার্থকতা কি— সে বিষয়ে ধন্দ থাকলেও সার্থকতার তীর্থে এই ভ্রমণ অস্বীকার করবার সাহস যেহেতু নেই, অগোচরে আমার কোষ তন্তুতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে তীব্র এক আবেগ, 'সার্থক হোক, ওরা সার্থক করুক এই ক্ষুধাজন্ম'!

তেরো•

জয়তীর প্রসঙ্গে আরও একবার ফিরতে হচ্ছে। ফিরতে হচ্ছে ওর একান্ত কিছু উপলব্ধির মাঝখানে। যে অভিজ্ঞতা এক জীবনে অর্জন সতত হয়ে ওঠে না, হয়ত শিল্পী বলেই ও পেরেছে তাকে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণে অক্ষরে গেঁথে তুলতে। প্রসঙ্গটা এলো খুবই আকস্মিক জয়তীর একটি চিঠি হাতে এসে পড়ায় :

Be thus when thou art dead...

সুজন বন্ধু আমার—

মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে কখনও বোধহয় দেখোনি তুমি। তুমি দেখোনি আমি জানি। জানি, কেননা আমি চাই না মৃত্যুর খুব কাছ দিয়ে তুমি হাঁটো। কিন্তু আমার বিপর্যয় কিভাবে প্রলুব্ধ করছে নিবিড় ওই শব্দে, তোমাকে বোঝাতে পারলেও, এই চিঠি সে কারণে তোমাকে লিখতে হচ্ছে না। এই লেখা একটি আমন্ত্রণ। কিছুক্ষণ তোমার পাশে বসবার, তোমার সঙ্গে নিঃশব্দ কিছু কথা বলবার। বোধহয় একটা

ভাঙন্ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এই গ্রহটা থেকে আরও দূরে, আরও অনেক দূর। তোমার বাঁধন আমাকে আড়াল করলেও করতে পারে। আমি নিশ্চিত নই, তবু মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে হয়ত এক অন্তর্লীন থেকে আমি নিষ্কৃতি পাব।

বরং একটু সহজ করে বলি— এবারের দেখা হওয়াটা অন্ততঃ আমার দিক থেকে কিছুটা অন্যরকম ছিলো। তোমার মনোযোগ তাকে এড়িয়ে যায় নি। হয়ত তুমি চমকে উঠেছিলে যখন বারবার তোমার ফিরে আসবার দিনক্ষণ জানতে চেয়ে আমি বিরক্ত করছিলাম। কিন্তু অসহায়, অসহায়ের মত স্বীকার করছি তুমি ছাড়া এই মুহূর্তে আমাকে জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই। মাসদুয়েক আগে সেদিন ছিলো বুধবার, বৃষ্টির রাত। ঘরে বসে একটা ছবিকে সম্পূর্ণতা দিতে চাইছিলাম। যতবার তুলি নিয়ে ছবির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি, আমার চিত্রায়িত রঙ আর রেখা বারবার মুছে যেতে থাকলো চোখের সামনে থেকে। ক্রমেই সাদা হয়ে উঠছে গোটা ক্যান্ভাস। অঙ্কুর, তোমাকে বোঝাতে পারব না, স্পষ্ট মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত এক শ্বেতবর্ণের অগ্নিতে দাউদাউ জ্বলে যাচ্ছে গোটা ক্যান্ভাসটা। যতবার আমি সচেতনভাবে বুঝতে চাইছি পুরো ব্যাপারটা, ততই তীব্র হয়ে সেই সাদা আগুন যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো গোটা ঘরময়। তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো, ক্রমেই সেই উজ্জ্বল আলোর রেখা আমাকেও স্পর্শ করল। আমার চোখ চুল স্তন যোনী নাভী, যাবতীয় স্নায়ু ও ধমনী, মেদ মাংস রক্ত কোষ সব— সব একাকার। মনে হচ্ছে গলে যাচ্ছি আমি। যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

গ'লে গ'লে বিরাট এক আলোর ঢেউ ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করেছে আমাদের হস্টেলবাড়ী, বৃক্ষসার, গোটা শান্তিনিকেতন মুছে যাচ্ছে অপরূপ স্রোত থেকে স্রোতে। খুলে যাচ্ছে ছায়াপথ, অনন্ত সূর্যের মুখ ম্লান সেই আলোকময়তায়। অঙ্কুর,

আমি ভয় পেয়েছিলাম নাকি তীব্র কোন ঘন শিহরণ মনে নেই —তবে পরদিন বান্ধবীরা যখন ডেকে তুলল মেঝে থেকে, সেই অসমাপ্ত ক্যানভাসের সামনে তুলি হাতে মূর্ছিতা নিজেকে আবিষ্কার ক'রে লজ্জিত হলেও কাউকে বলতে পারি নি গোপন এই অনুভূতির কথা। শুধু সেদিন সকালে চোখ মেলাবার পর থেকে সব কিছুই কেমন নতুন লাগছে। প্রচণ্ড নির্ভার লাগছে নিজেকে আর সবকিছুই খুব অর্থহীন মনে হচ্ছে। সবকিছু। প্রিয় পরিচিত মাঠ ঘাট বন্ধু স্বজন এমন-কি রঙ তুলি ক্যান্‌ভাস, ছবি আঁকাআঁকি, দিন রাত দুপুর বিকেল, মানুষের সমস্ত প্রয়াস প্রয়োজন খুব অর্থহীন হয়ে গ্যাছে। কেবলই স্মৃতির মুখ খুলে গিয়ে ভেসে উঠছে উষ্ণ সেই আলোর ভাসান্। আর সেদিন সকাল থেকে প্রাণপণ পরিত্রাণ খুঁজছি। বলতে পারো আমি পালাতে চাইছি। এই পলায়নটাও বিশ্ব পরিক্রমার পথে নয়। নিজের থেকে নিজে-কে বিচ্ছিন্ন করা। সব কাজ ফেলে রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছি সেই হঠাৎ অনুভূত সুমন্ত আলোর গভীরে। বোধহয় জীবনানন্দের 'অনন্ত মৃত্যুর' মুখ এমনই নির্ভার, এমনই অপরূপ, শুভ্র সেই জ্যোতির সমুদ্রে।

জানিনা, এই শব্দপংক্তি তোমাকে স্পর্শ করবে কিনা! তবু এই চিঠি যখন লিখছি, এই মুহূর্তেই তোমাকেও ভাস্বর হয়ে মুছে যেতে দেখছি সেই জ্যোতির জোয়ারে। মিথ্যে বলব না, শরীরকে ঘিরে সাজিয়ে রাখা যে সংস্কারে এতদিন আমি জয়তী ছিলাম—সেই সংস্কার ফেটে গ্যাছে। চরম এক নগ্নতায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে, মুহূর্তেরও ভগ্নাংশে আমার অনন্ত ক্ষরণ। অনন্ত আমি যেন খোলস খুলতে খুলতে হারিয়ে ফেলছি পরিমিত আয়ু। সামনে অবাধ এক চিতা জ্বলছে দাউদাউ আর সেই আপাত মৃত্যুর দিকে শরীরটা কি দ্রুত দৌড়ে চলেছে। অঙ্কুর, মৃত্যু যদি শেষ আবিষ্কার মানুষের, তবে এই থাকা কেন! মৃত্যু যদি

শেষ পরিণতি মানুষের তবু চতুর্দিকে এত প্রয়াস কেন, এত কোলাহল, এত সার্থকতা ব্যর্থতা কষ্টকর দিনযাপন কেন! কি হবে ক্যানভাস জুড়ে রঙের তুফান নাচিয়ে? কি হবে প্রতি দিন এত সত্য মিথ্যে জয় পরাজয়ের সহস্র সংঘাতের মধ্যে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে, নম্র ঘুমের কাছে ফিরে ফিরে আসা, রাত্রি জাগরণ, দিনের চূড়ান্ত শিখরে পুনরায় আহার সন্ধান? বন্ধু আমার, সব হারানোর একটা ভয় আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, আর, তত তীব্র হয়ে উঠছে তোমার মধ্যে আশ্রয় খোঁজবার এক অসহ্য তাড়না। যেন তুমিই পারো এই স্রোত ঠেলে আমাকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে দিতে। স্মৃতি ভুলিয়ে তুমি ফের ফিরিয়ে দিতে পারো আমার রঙ তুলি ক্যান্‌ভাসের আড়ালে একাগ্র বেঁচে থাকবার চপল স্ফুর্তি। অসহায়ের মত সে রাতের পর থেকে তোমাকে কাছে পাবার জন্য প্রায় উন্মাদের মত অপেক্ষা করেছি, উন্মাদের মত। ছবি আঁকা বন্ধ। দাঁড়াতে পারছিনা প্যালেট হাতে। বোধহয় বুঝতে পারছ আমার প্রকৃত ক্রাইসিস্‌টা। সাধারণ কয়েকটি জৈব আকাঙ্খায় পুরুষ বন্ধুকে অবলম্বন করবার হীন প্রবণতা কখনও ছিলনা, এখনও নেই। এই নতুনতর অস্তিত্বহীনতার যে সংকট আমার চারপাশে ঘোলাটে হয়ে উঠছে, তোমার ঘনিষ্ঠ বাহু হয়ত কিছুটা আড়াল করতে পারে। যদিও আমি জানি, যে উজান্‌ জেগে উঠেছে আমার স্মৃতিতে, তোমার অস্তিত্বও সেখানে তুচ্ছ, লীন্‌ হয়ে যাবে যে কোন ঘূর্ণিতে। তবু মনে হচ্ছে কিছুদিন, যেন আরও কিছুদিন তোমার মধ্যেই খুঁজে নিতে পারি আমার আপাত পলায়ন।

এবার বুঝছ তো— কেন বারবার তোমার ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতিতে সাক্ষাতের শেষ সন্ধ্যায় অত উতল হয়েছি! বুঝতে পারছ তো অঙ্কুর, তোমার প্রতি কোন্‌ প্রত্যাশায় ভারী হয়ে উঠছে আমার চিবুক! নিরন্তর এই খণ্ডিত

জয়তী আদিগন্ত ভাঙনে দাঁড়িয়ে এক অবলম্বন চাইছে। এও জানি— সেই অবলম্বন কোথাও নেই, কোথাওই পাওয়া যায়-না, তবু এক অন্ধ আকাঙ্খায় আমি আকুল হয়েছি। আর পারছিনা— আবার — আবার সেই মৃত্যু আসছে। সেই মৃত্যু — শব্দ অক্ষর ধ্বনি একাকার হয়ে যাচ্ছে। পালাও— পালাও অঙ্কুর— অন্ততঃ তুমি থাকো হাজার বছরের এক ঋজু বৃক্ষ .. ..

চোদ্দো.

চিঠিটি যদি এখানেই শেষ হত, বোঝা যেত জয়তী এক চিরকালীন জিজ্ঞাসায় আপাততঃ ক্লান্ত। জীবন মৃত্যুর এক সীমারেখা ছুঁয়ে, তাৎক্ষণিক সময়পরিধিজুড়ে মানুষের যে সাঁতার সেই তাৎক্ষণিকতাকে নানাভাবে মানুষ ভরিয়ে তুলতে চেয়েছে অর্থবহ অঙ্গীকারে। এত যে শিল্প দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত—সব কিছুতেই কালসমুদ্র পেরিয়ে যাওয়ার সফল অহংকারের যেন উদ্ধত ঘোষণা। তবুও সবকিছুর উর্দ্ধে চিরন্তন এক জিজ্ঞাসা সততই জাগিয়ে রাখে মননশীল মস্তিষ্ক। আর সেই মস্তিষ্কেরই সাময়িক অবসাদে আলোয় উজ্জ্বল মহা এক সিন্ধুকল্লোল কখনও জেগে ওঠে, কখনও ধ্বনিময় অবগাহনে ভাস্বর হয়ে ওঠে নৈশব্দের এক অসীম মহাবিশ্ব। চিত্রশিল্পী তাকেই ব্যাপ্তিত করতে চায় রঙ তুলি ক্যানভাসের প্রতিটি আঁচড়ে। এই মহাকাল কোন দূর অতীতবিন্দু থেকে ক্রমশ ধাবমান ভবিষ্যতের অজ্ঞাত কোন প্রলয় গর্ভে। তারই কাছে নতজানু মানুষের অমল চিৎকারেরই নাম সমর্পণ। হে কাল, হে মহাবোধি— যতদূর নিয়ে যেতে চাও. চলো, নিয়ে চলো। আমার কোন আকাঙ্খা নেই, প্রত্যাশা নেই, স্বপ্ন সাধ ঘুম জাগরণ একাকার অন্ধ গমন। নিয়ে চলো সেই প্রলয় যাত্রায়— যতদূর পারো আমাকে নাও!

কিন্তু জয়তী এই বোধের কাছে নোয়াতে চায়না মাথা। সে ফিরতে চাইছে নিজস্ব আকাঙ্খার সোপানে, তাই সে ক্লান্ত। তাই সে বন্ধুর

কাছে আড়াল খুঁজছে, খুঁজছে নোঙর গিঁথে দাঁড়িয়ে পরবার একটা আশ্রয়, নির্মাণের সাধ তাকে উতলা করছে বন্ধুত্বের নিবীড় বাহু জড়িয়ে থাকতে। আর এই সাধ, এই আকাঙ্খা নিয়েই মানুষের সমাজ সংসার এবং প্রজন্মের দীর্ঘ ইতিহাস। তাৎক্ষণিকতার উর্দ্ধে উঁড়িয়ে রাখা সভ্যতার বিজয়ধ্বজা। হোক সাময়িক, তবু সে পূর্ণ হবে প্রজন্মের পায়ে পায়ে। জয়তীর আলোক সাক্ষাৎ তেমনই এক শুরুর সূচনা। মৃত্যুকে গভীরভাবে চিনেছে বলেই মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পে হয়ত প্রবেশের সুযোগও হয়ে উঠবে অবধারিত। সম্ভবতঃ এমনই এক ইঙ্গিত রয়েছে চিঠির পরবর্তী অংশে। এই শেষের অংশটুকু দিন পনেরো পর, পরে লেখা হয়েছে দিনাঙ্ক দেখেই বোঝা যাচ্ছে—

.........চিঠিটি শেষ করবার একটা দায় নিয়েই আবারও লিখতে বসলাম। এই কয়েকদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গ্যাছে। জানাতে চাইছি এই কারণে, হয়ত তোমার কাছেও কখনও কোনও একদিন প্রয়োজন হয়ে উঠতে পারে অন্তর্গত এইসব অভিজ্ঞতার। বন্ধু তুমি একদিন কথায় কথায় বলেছিলে— জীবনটা ঠিক ততটুকুই হওয়া উচিত যেটুকুর মধ্যে আমাদের প্রতিদিন পুনর্জন্ম থাকে। খুবই সাধারণ কথা এবং অত্যন্ত কম গুরুত্ব দিয়ে এড়িয়ে গেছিলাম অন্য কোন প্রসঙ্গে। সম্ভবতঃ গাছগাছালি কিম্বা জন্তুজানোয়ারের প্রাণ-বিষয়ক কোন আলোচনায়। কিভাবে তুমি অর্জন করেছিলে সেই বোধি জানিনা, কিন্তু সেই কথাটাই আমার শিক্ষক পুন-রায় ফিরিয়ে দিয়ে বোঝালেন সাম্প্রতিক যে মানসিক অবসাদ বা দার্শনিক সংকটের মধ্যে আমি হারিয়ে ফেলছিলাম জীব-নের প্রতি অনুরাগ— এই আকস্মিক উপলব্ধিটাই নাকি আমার দ্বিতীয় জন্ম। অর্থাৎ এই প্রথম আমার শিল্পীস্বত্তা শিল্পের ভূমিতে আমাকে অবধারিত করে তুলছে জীবনকে অভিব্যক্ত করতে। পাশাপাশি তিনি শিল্পের ইতিহাস এবং

প্রতিটি নবতম ধারার প্রখর বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে ব্যাখ্যা করলেন। এই প্রথম অত্যন্ত তাৎপর্যময় হয়ে উঠল এই বিশেষ শিল্পমাধ্যমটির প্রতিটি খুঁটিনাটি পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা। এতদিন যা ছিল অনুশীলনের, আজ তাই হয়ে উঠেছে উপলব্ধির। আমার চারপাশজুড়ে প্রতিনিয়ত অনন্ত ছবি। প্রতিনিয়তই অদ্ভূত আকাঙ্খায় চোখ মেলছি ক্ষুদ্রতম বস্তুরও গভীরে। কিছুই ক্ষুদ্র নয় অঙ্কুর, শাশ্বত এক প্রাণের বন্যায় বিচিত্র হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তিক পথচলা। কি অপূর্ব লাগছে দিগন্ত। মেঘ কেটে যাওয়ার পর যে আলো ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো সমগ্র অস্তিত্ব, যার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তোমার মধ্যে নোঙর খুঁজছিলাম, এখন সেই আর্তি আর তত তীব্র নয়। এখন বুঝে গেছি শিল্পের মধ্যেই আমার সম্পৃক্তি। পরিত্রাণও এই শিল্পভূমিতেই। কিন্তু তার মানে এই নয় তোমার বন্ধুত্বকে আমি অস্বীকার করছি। বরং তুমি থাকো, অনন্ত বছর ঘনিষ্ট হয়েই তুমি থাকো। তবু একটি সত্যকে তোমারও জেনে নেওয়া দরকার—তোমার অস্তিত্ব আজ আমার কাছে খুব একটা অপরিহার্য কিছু নয়। ঠিক যেমন আমরা আগে ছিলাম, সেভাবেই রয়ে যেতে পারি। পারলে, কখনও এসো আবার।

শুভেচ্ছা রইল অনেক—

জয়তী।

চিঠি শেষ করবার পরেই যে কাগজের মাথায় ওথেলো কোট্ করা হয়েছে, সেটা বুঝতে ভুল হল না। কারণ প্রথম অংশের সঙ্গে মিল নেই ওই মৃত্যুত্তীর্ণ ভালবাসার প্রার্থনা বা আকাঙ্খার। বরং শেষের অংশের চূড়ান্ত সত্য উচ্চারণকেই হয়ত কিছুটা হাল্কা করতে গিঁথে দিয়েছে 'Be thus when thou art dead.' চিঠিটা পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ সাধারণ কোন আবেগের প্রশ্রয়ে বিমর্ষ ছটফট হয়ত কিছুটা মানাত। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কোন

পরিবর্তন আমার হল না। হয়ত এর পেছনে কারণটা এমনও হতে পারে, আমার সামনে তখন অন্য এক শিল্পীর সম্প্রতি দেখা উজ্জ্বল এক মুখের প্রতি আত্মসম্মোহন! যে মুখটা প্রলয় মজুমদারের। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর পরিবর্তন যে আমারও কিছু হয় নি জোর দিয়ে বলতে পারব না। অন্ততঃ এটুকু বুঝেইছি— জীবন মানে হঠাৎ কিছু হয়ে যাওয়া নয়। জীবন মানে একটি প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই পূর্ণতার সন্ধান— যার বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে যায় অসংখ্য বিচ্যুতি, অসংখ্য উর্দ্ধক্রমণ।

জয়তী যদি মনে করে শিল্পই তাকে পৌঁছে দেবে সেই আকাঙ্খিত পূর্ণতায়— সে পথ ধরে হাঁটবার স্বাধীনতা তার রয়েইছে এবং এমনটিই আমিও চেয়েছি। কিন্তু আজ যে সত্য ওর ধরাছোঁয়ার মুঠোয় এসে গেছে বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃত অর্থে তাকে অর্জন করার জন্য বাজী রাখতে হবে একটা গোটা জীবন। আর এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্লান্তিও এক অমোঘ প্রাপ্তি। প্রয়োজন হবে সেখান থেকে উত্তরণেরও। ঠিক তখনই আবার টনটনিয়ে উঠবে ওর বুক ঘনিষ্ঠ কোন ব্যথায়। যে ব্যথার পরিত্রাণ শুধুমাত্র রঙ তুলি ক্যানভাস দিতে পারে না। উপশম খুঁজতে হয় সহমর্মী অন্য এক হৃদয়ে। সে হৃদয়ের অধিকারী কেবলমাত্র মানুষ। 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'। বন্ধুত্বের যে অপরিহার্যতা আজ জয়তীর মনে হচ্ছে গৌণ, হয়ত এক বিষণ্ন সন্ধ্যায় সেটিই হয়ে উঠতে পারে মুখ্য প্রতীক্ষা। হয়ত অন্য কেউ, অন্য এক প্রার্থিত পুরুষের বুকে ঘনায়মান অন্ধকার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সত্যদর্শী আজকেরই এই জয়তীকে। ঠিকই করে নিলাম আপাতত এই দিগন্ত আমায় ভুলে যেতে হবে। বরং প্রয়োজনের ডানায় চেপে আমন্ত্রণে আবারও যদি অপরিহার্য হয়ে ওঠে এই হয়ে-ওঠা শিল্পীর চিবুক, তখন দাঁড়াব পুনর্বার সেই সাক্ষাৎ সমীপে। জয়তীর উদ্দেশ্যে আমিও উচ্চারণ করতে পারি বায়রনের সেই অমোঘ পংক্তি— No eyes / but only mine now drink / this sight of loveliness. হয়ত আমার সামনে নির্বাসন নেওয়ার মত টিলার মাথায় কোন প্রাচীন

দুর্গ নেই, কোন যাজকের নিষ্ঠুর একগুঁয়েমি বাধ্য করতে আসবেনা ধর্মের নামাবলি চাপিয়ে প্রত্যহ প্রার্থনায়; বরং আরও কিছুদিন মানুষের প্রপাতের পাশে একা এবং স্বতন্ত্র্য অধ্যবসায়ে, জীবন ও পৃথিবীকে বোঝবার ও বোঝাবার তাগিদে আরও দীর্ঘ করতে পারি পরিব্রাজন। এ শপথ আমার একাগ্র বেঁচে থাকবার! মৃত্যুর বিরুদ্ধে এ উচ্চারণ জীবনের একটা জয়ের। কাউকে চাইনা— আমার নিজস্ব চোখদুটোই সুন্দরকে উপভোগ ও অভিব্যক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। আমাকে গ্রহণের প্রয়োজন যদি জয়তীর কাছে অবধারিত না হয়ে থাকে তবে তার এটুকুও জানা দরকার-- জয়তীও আমার কাছে তেমন অপরিহার্য কিছু নয়। আমরা কাছে এসেছিলাম দুজনাকে দুজনার জড়িয়ে ওঠবার স্বতন্ত্র্য ও অন্তর্গত তাগিদে। কাছে এসে-ছিলাম— এই সত্যটুকুও ততটুকুই সত্য যার মধ্যে কিছু শর্ত আরো-পিত থাকে। আজ যদি ও' সেটা বুঝতে পারে তবে সে সার্থক। কিন্তু আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করার মধ্যে আর যাই থাকুক, শিল্পী-সুলভ মমতার চিহ্নটা কর্কশ হয়ে গ্যাছে। অথচ প্রলয় মজুমদার আঠেরো বছর ছবির কাছ থেকে সরে থেকেও এখনও কত সুন্দর। এখনও কত সহৃদয়তায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায় তুলে দিচ্ছে একদার বন্ধু, একদার পরিচিতা পূর্ণিমার দিকে। শিল্প তো এটাই। জীবন-কে সুন্দর করবার জন্যই তো মানুষের সমস্ত উৎকর্ষ। সমস্ত ললিত কলা--- ভাস্কর্য এমনকি গ্রামের তথাকথিত অশিক্ষিত পটুয়াদের তুলিতেও যে জীবন নেচে ওঠে, সেও তো প্রতিবেশীদের মুখকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে চেয়েছে গভীরতর সত্যের আলোয়।

জয়তীর শিল্পযাত্রা সার্থক হোক যেমন চাইছি, শিল্পের অন্তর্গত আলোয় সে নিজেও সুন্দর হয়ে উঠুক, চাইছি তেমনটিও। আজকের দিনে বোধহয় এটাই বেশী প্রয়োজন। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনটাও একটা নান্দনিক শিল্প হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ স্যাচুরেশন্। শরীর, মন ও কথায় এক আদর্শ নির্মাণ— Creativity through body speech and mind. আর তা না-হলে ছবি আঁকাটা প্রকৃতই

অর্থহীন হয়ে যাবে। আপাতত জয়তীর জন্য একটি ছোট পোস্ট-কার্ডে গেঁথে দিলাম সাধারণ কয়েকটি শব্দ—

জয়তী,

তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেও যদি কখনও অপরিহার্য হয়ে উঠি, ডেকো। শরীর পৌঁছতে না পারলেও ইচ্ছে পৌঁছবে।

ভালো থেকো, শিল্পে থেকো—

শুভেচ্ছাসহ, বন্ধু অঙ্কুর।

অন্য চিঠিপত্রের মত এটিরও একই পরিণতি হয় নি। যথেষ্ট আনন্দ-গত্যেই ডাকবাক্সে ফেলা হয়েছিল। এবং পোস্ট করবার পরে হঠাৎই মনে হল পর্ণাকেও একটি চিঠি দিতে হবে। প্রায় দু-মাস এসেছি বাঁকুড়া থেকে, এখনও সেভাবে আর ভাবাই হয়নি মানুষগুলোকে। এবার বোধহয় কিছুটা ভাবা দরকার। দরকার কারণ, জয়তী আমাকে একটা শিক্ষা দিয়েছেই, সেটি সততার। অসম্পূর্ণ চিঠিটি ও' ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারত, ফেলে দিতে পারত ডাস্টবিনে! কিন্তু সেটি না ক'রে, পরিবর্তিত মানসিকতার ছবিটিও গ্রথিত কোরে আমার হাতে তুলে দিয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এক অসাধারণ ইশ্তেহার। এবং এই পাঠানোর পিছনে বন্ধুর সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগ ক'রে নেওয়ার এক অঙ্গীকারও ওর মুখেই উচ্চারিত হয়েছে। এখানেই জয়তীর সততা। এখানেই জয়তী কিছুটা স্বতন্ত্রও। আর বন্ধুত্বের এই মুখোশহীন সঙ্গলাভটুকুও একটি জীবনের কাছে অনেক বড় কোন প্রাপ্তি। এই সত্যটুকু স্বীকার না-করলে হয়ত মিথ্যেচারীতার দায়ে আমিও দায়ভাগী হয়ে পড়ব। আর এই সমীক্ষা করতে বসে ঠিক এই মুহূর্তেই পর্ণার কথাটাও মনে হওয়া স্বাভাবিক। মেয়েটি আমার কাছে বন্ধুত্ব আকাঙ্খা করেছিল। সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে না-পারলেও, অন্ততঃ ছোট্ট একটি চিরকুটে ' কেমন আছো ' এটুকু জানতে চাওয়াটা মানুষ হিসেবেই আমার করা উচিৎ। এই ঔচিত্য-বোধটুকু এখনও আছে বলেই, প্রচন্ড নিষ্ঠুরতায় পারিপার্শ্বিক বিধি

ও ব্যতিক্রমের যাবতীয় দেওয়াল দরোজা লাথি মেরে ভেঙে, ছড়িয়ে দিয়ে ছিটকে উঠতে পারছি না চরম অরাজকতায়। পারছি না জীবনের টুঁটি টিপে ভাসিয়ে দিতে চূড়ান্ত চিতায়। অনেকে চাইছে, অনেকে করছেও। অন্ততঃ আজকের ভারতবর্ষের ইতিহাস চরমতম অস্থিরতায় কাঁপছে— এ-কথা বলাই যায়। পৃথিবীও ব্যতিক্রম নয়। প্রায় প্রতিটি মহাদেশেই অতর্কিত যুদ্ধের প্রতিরোধে এলোমেলো হয়ে গ্যাছে আভ্যন্তরীন বাতাবরণ। এই যুদ্ধ কখনও ধর্মের নামে রক্তপিপাসা, কখনও ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতালিপ্সায় সংমোহিত অবোধ মানুষদের লোভ ও নিষ্ঠুরতার আকস্মিক উল্লম্ফন, আবার কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত ক্ষুধার্ত্ত চিৎকার। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীর ' রণ রক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয় '— তাই এই সাদা পৃষ্ঠা ভরিয়ে মানুষের অন্য এক আত্মগত ব্যথার উপক্রমণিকা। নিজেকেও প্রস্তুত করে তোলা সমৃদ্ধতর আরও এক জীবনবোধে, যেখানে নিজের প্রয়োজনগুলো তুচ্ছ কোরে অনেক মানুষের হার্দিক উষ্ণতার মধ্যে নিজেকে ব্যপ্ত করা যায় আনন্দ বেদনায়। তাই এই মানুষের পাশে বসে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে নেওয়া তৃষ্ণিম চিবুক।

মনে হয় একাকীত্বের যে আগুনে নিরন্তর ঝলসে যাচ্ছি, সেই একাকীত্বে আক্রান্ত আমি একা নয়। প্রতিটি মানুষ ভীতরে ভীতরে গভীরভাবে কোথাও পুড়ছে। নিষ্কৃতি নেই, নিষ্কৃতি মেলেনা কখনও কেবল একাকীত্ব ভুলে থাকবার ছলনায় মানুষ কখন যেন পাথর হয়ে যায়। নিজেকে ঠকাবার খেলায় জীবন্ত এক যন্ত্রের মত এঘর থেকে ও-ঘর, ও-ঘর থেকে সেঘর— একসময় শেষ হয়ে যাচ্ছে পরিমিত সময়। আকাশজুড়ে খুলে যাচ্ছে বিশাল এক অন্ধকারের হাঁ। আর সেই গহ্বরের মধ্যে নিমেষেই উবু হয়ে যাচ্ছে একেকটি ব্যক্তিগত জীবন। ব্লটিঙের মত ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে সচল এক দুপায়ের অস্তিত্ব। মৃত্যু। এই আকস্মিক নিভে যাওয়া, চাইনা। কিছুতেই নয়। বরং সমর্পণ নাও হে মহাকাল, স্বেচ্ছা-নিবাসনে নিজেকে মুছে ফেলবার অধিকার থাকুক মানুষের হাতে। আত্মহনন, প্রত্যহ পাথরতা থেকে স্বেচ্ছা এক মহা-অন্ধকারে ছুটে যাওয়ার

অহংকার। এই অহংকারের মধ্যেও চূড়ান্ত এক জয়ের ঘোষণা। বিজয়ী হওয়ার এই অধিকার মানুষের থাকা উচিত। অন্ততঃ শেষ এক ঔদ্ধত্যে অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মানুষ বুঝে নিতে পারে কালো সেই গহ্বরের বিশাল ব্যাপ্তি। তারপর অট্টহাসি। খান্-খান্ ত্রিকাল চৌচির ক'রে চূড়ান্ত লাফ। মৃত্যু— the loneliest horizon where man can swim with a long breath. দু-হাতের থাবায় এক নিষিদ্ধ লাগাম। দীর্ঘ অশ্বক্ষুরে মৌনতা ফাটিয়ে ছুটে যাওয়া অন্য এক দিগন্তরেখায়। যা জীবন নয়, জীবনের আর এক অন্য অবগাহন। এই অবগাহনের অধিকার মানুষের অর্জনের মধ্যে থাকা উচিত। আর ঠিক তখুনই বলা যেতে পারে— 'Be thus when thou art dead.'

পনেরো.

পর্ণাকে চিঠি লেখবার কথা ভাবলেও খুব সহজে সেটা হয়ে ওঠেনি। আমিও হন্যে হয়ে উঠেছি নতুন জীবিকার সন্ধানে। নামে বেনামে পত্র-পত্রিকায় মাঝেমধ্যে দু-একটি ফিচার-টিচার লিখলেও তেমন সুস্থিত রোজগার কিছু নেই। অস্তিত্বরক্ষার এই প্রতিকূলতার ধাক্কায় নিজেই এত টালমাটাল হয়ে আছি, কারো প্রতিই তেমন কোন উৎসাহ আগ্রহ যেন খুঁজে পাচ্ছিনা। বেসামাল পায়ের পাতায় কখনও রুক্ষ হয়ে উঠছে মাটি, কখনও রাত্রিজুড়ে প্রবল সব দীর্ঘশ্বাস। এ-সব সময় নিজের ওপর ধিক্কার জন্মানো ছাড়া আর যে কাজটিতে যাবতীয় শোক তাপ ভুলে থাকা যায়— সেটি অবশ্যই চুটিয়ে নারী-সঙ্গ। সে উপায়ও নেই কারণ মগজটা এখনও মগজেই রয়েছে। পারিপার্শ্বিক অজস্র ঘাতপ্রতিঘাতে যেভাবে তীব্র হয়ে উঠছে সময়, সে সময়ে কারো বুক ছুঁয়ে নেওটা বিড়ালের মত ঘুরে বেড়ানোও বড় লজ্জার। বস্তুতঃ এইসব বোধফোধগুলোর বাইরে যদি বেড়িয়ে যাওয়া যেত, বোধহয় আরও কিছুদিন জুতোর শুকতলা খুইয়ে মজায় বাঁচা যেত। অন্য যে উপকরণটি সহজেই আকর্ষণ করে সেটি নিঃসন্দেহে সস্তার মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি। তাও পারছি না।

তাতেও দেখছি মূর্ছিত হয়ে ঘুমিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত চেতনাটা চেতনাই থাকে। কেবল স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে গিয়ে পথঘাট টলিয়ে দেয়।

ঠিক এরকম এক কষ্টকর বেঁচে থাকবার মধ্যেই হঠাৎ একদিন প্রলয়বাবুর চিঠি এলো। চিঠিটি কলকাতা থেকে এসেছে। বিশেষ কিছু লেখেননি, কেবল আমন্ত্রণ হয়ে উঠেছে আন্তরিক। আপাতত স্কুলের চাকরি ছেড়ে উনি কলকাতাতেই এসে আছেন। এবার শুধু ছবি আঁকা। পূর্ণিমা ওকে ওর মত করেই বাঁচবার স্বাধীনতায় ছুটি দিয়ে দিয়েছেন এবং সেটা ভালোবাসার অধিকারেই। প্রলয়বাবুর কিছুটা সঙ্কোচ থাকলেও, একরকম জোর করেই স্কুলের চাকরিটা থেকে ছাড়িয়ে পূর্ণিমাদেবীই ওনাকে কলকাতা পাঠিয়েছেন। ভদ্রমহিলা এও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, গবেষণার কাজটা নিজে আবার শুরু করবেন। শর্ত্ত একটাই— মাঝেমাঝে শিল্পীকে কয়েকদিন বাঁকুড়ায় ঘুরে দেখা করে আসতে হবে। এবং সেটাও খুব স্বাধীন ইচ্ছাতেই। কাজ করতে করতে যখন বিশ্রামের প্রয়োজন হবে তখনই যেন বেড়িয়ে পড়েন প্রলয়বাবু। জোর ক'রে কোন নিয়মমাফিক ভেট নয়। পূর্ণিমাদেবীর স্কুলে সম্প্রতি এক দপ্তরী রিটায়ার করেছেন, তিনি উপযাচক হয়ে তাদের বাড়ীতে স্বল্পবেতনের অ্যাটেন্ডেন্টের কাজ চেয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোকেরও সংসারে কেউ নেই সুতরাং এ বাড়ীর টুকিটাকি ফাইফরমায়েসের মধ্যে দিয়ে তার সময়টাও ভালো কেটে যাবে। অসুবিধেটা পর্ণাকে নিয়েই বেশী হয়েছে। সে আর কিছুতেই বাঁকুড়া থাকতে চাইছে না। কলকাতায় এসে প্রলয়বাবুর কাছে থাকতেও তার সম্মতি নেই কারণ শিল্পীর ওপর নতুন কোরে নিজের দায়ীত্ব চাপাবার ইচ্ছে তার আর নেই। যদিও ব্যাপারটার শিকড় আরও গভীরে। আমি চলে আসবার পর নাকি একদিন পর্ণা প্রলয়বাবুর বুকে যে উদ্দাম আবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল— আলিঙ্গনের সেই বন্য প্রবণতা নাকি পূর্ণিমাদেবীর আদৌ ভালো লাগেনি। পিতা-কন্যার আদরের পরিচিত অভিব্যক্তির চিরন্তনতা থেকে সে আলিঙ্গন তার মনে হয়েছে অন্যরকম। অনেকটাই যৌনগন্ধী।

এ-ছাড়াও শিল্পীর সঙ্গে পূর্ণিমার নবনির্মিত সম্পর্কটিকেও পর্ণা নাকি মেনে নিতে পারছে না বলেই পূর্ণিমার বিশ্বাস। হয়ত তার অবিশ্বাসের দৃষ্টি থেকে রেহাই পায়নি শিল্পী নিজেও। সুতরাং এক সন্ধ্যায় পূর্ণিমা নিজেই আগ্রহ সহকারে দীর্ঘক্ষণ প্রলয়বাবুকে বুঝিয়ে গ্যাছেন, পর্ণা তার নিজের মেয়ে নয়—সুতরাং ওর প্রতি দুর্বলতা প্রলয়ের জেগে উঠতেই পারে কারণ মানুষতো পাথর নয়! সর্বোপরি, শিল্পীমনকে উস্কে দেওয়ার মত জ্বালানী ওই তরুণীর মধ্যে রয়েছেই। অতএব পর্ণার সঙ্গে ভদ্রলোকের মেলামেশাটাও কিছুটা সংযত হওয়া দরকার। প্রলয়বাবু খুব মজা কোরে লিখেছেন, 'নিজেরই আত্মজের কাছে হেরে যাওয়ার লজ্জা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই আমার মুক্তি ঘোষণা করা হল কিনা জানিনা, তবে তড়িঘড়ি আমায় কলকাতায় পাঠাবার জন্য পূর্ণিমার যে গভীর ব্যস্ততা সেটি শুধু শিল্পের কাছে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার তাড়না যে নয়, এটুকু বলতেই পারি'। পাশাপাশি ভদ্রলোক আরও লিখেছেন,—এত কাছ থেকে অসম-বয়সী দুই নারী এবং সম্পর্কের সূত্রে যারা মাতা-কন্যা, তাদের মধ্যে এমন নিবিড় বিবাদ কখনও দেখবার সৌভাগ্য আগে কোনদিন হয়নি। পশ্চিমের দেশগুলোয়, অন্ততঃ সাহিত্যে এ-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন থাকলেও বাস্তব-ক্ষেত্রে এমন কোন পরিবার তথা দুই মানুষী অবয়বের মুখোমুখি আগে কখনও দাঁড়াইনি। সম্ভবত একটা জীবন এইসব দুষ্প্রাপ্য অভিজ্ঞতাকে সবার কাছে পোঁছে যে দেয়না, এটাও খুব জোর দিয়েই বলা যায়। অন্ততঃ ভারতীয় সমাজে তো নয়ই। এখানে অবশ্যই দূর-দূরান্তরে পাহাড় অরণ্যে ছড়িয়ে থাকা, ছোট ছোট আদিবাসী উপজাতী সমাজের প্রসঙ্গ আপাতত আমার মন্তব্যের এক্তিয়ারের বাইরেই রাখলাম। কারণ, ওদের সম্পর্কে পুরোটা এখনও জানা হয়ে ওঠেনি এবং যেটুকুও জানা গ্যাছে আমাদের মোড়ক-সভ্যতার শহুরে মানুষদের কাছে কিঞ্চিৎ বিস্বাদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ধারনা, খোঁজখবর, জানতে-চাওয়া মানুষদের মধ্যে রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। আপাতত

মূল প্রসঙ্গে ফিরি। যেটা বলছিলাম, পর্ণা এবং পূর্ণিমা, আমার চোখে একই আগুনের দুই ভিন্নতর প্রকাশভূমি। বয়স যেমন সেখানে গৌণ, সম্পর্কের সাজানো বন্ধনও ঠিক ততটাই। বরং পূর্ণিমা আজ অনেক বেশী নিষ্প্রভ। পর্ণা অনেক বেশী প্রোজ্জ্বল। সৃজনের অন্ধকারে পূর্ণিমার প্রাণপ্রতিমা আজ এক গন্তব্যের ভূমি-জুড়ে তরঙ্গ প্রক্ষেপনে অনেকটাই স্থির হয়ে গ্যাছে। কিন্তু পর্ণার নব-আবিষ্কৃত জোয়ারের মুখ, প্রবল ভাসানে নিমেষেই উড়িয়ে নিয়ে যায় যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম। সে অন্ধকার ফাটিয়ে দিতে চাইছে দু-হাতের উষ্ণ থাবায়। কি নির্মেঘ সেই দ্যুতি! কি বলিষ্ঠ সেই শিহরণ!

প্রিয় অঙ্কুর,

আমি যেন আবার ফিরে পাচ্ছি আঠেরো বছর আগের সেই সৌরঘূর্ণন। বলতে পারো এই বছরগুলো হারিয়ে, পর্ণা আমার এক নিঃশব্দ প্রাপ্তি। যে প্রেরণাশক্তির পায়ে একজন শিল্পী মুহূর্তেই বিলিয়ে দিতে পারে গোটা পৃথিবী, যাবতীয় বৈভব, এমনকি দু-হাতে ভারী হয়ে ওঠা এ ক্লান্ত জীবনকেও। পূর্ণিমা এসব বোঝে। বোঝে তার মাতৃত্ব দিয়ে নয়, তার নারীত্ব দিয়ে। সে বোঝে তার দেহে মনে আজ যে অসাড়তা, এই অনাকাঙ্খিত দৌর্বল্য তার কাম্য ছিলনা। তার স্বপ্নে এখনও এক আঠেরোর তরুনী প্রায়শই লাফ দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চায় সমস্ত পাথরতা—কিন্তু সে অসহায়। তাব বয়স, তার সামাজিক উপস্থিতি সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। তার পায়ে এখন এক সামাজিক শৃঙ্খল পায়ে পায়ে তাকে বাধ্য করেছে মাতৃময়ী মানময়ী অন্য এক স্থিতধি জীবনযাত্রায়। আর সেই সামাজিক প্রতিশোধ যখন আর কোথাও নেওয়ার সুযোগ নেই, সে সেই প্রতিশোধের আঙুল নাচাচ্ছে আপন আত্মজার প্রতি। বস্তুতঃ এই পরাজয়ের হাহাকার মাতৃত্বের নয় অংকুর, জীবনের অমোঘ পরিনতির কাছে হেরে যাওয়া এক মানুষির আর্তচিৎকার। তবুও বলছি—পর্ণাকে এখনও দূর থেকে দেখি, বুঝি, অত্যন্ত কম

প্রশ্রয়ে ওর আগুন ছুঁইয়ে রাখি আমারও বয়স্ক আত্মায়। এটুকু কি জীবনের কাছে আমার প্রাপ্য ছিলনা! কি পেয়েছি বল! ছবি আঁকবার জন্য ভিখারীর মত পরিত্যক্ত হয়েছি স্বজন সুজনের কাছে। ছেঁড়াখোড়া একটা অস্তিত্ব জড়িয়ে, একটা স্বপ্নকে আড়াল ক'রে ক'রে পথ থেকে পথে বেড়িয়েছি। যখন বুঝেছি স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে, তখনও বিচ্ছিন্ন হয়েছি। এক কর্তব্যের তাগিদে। নিরন্তর আঠেরোটা বছর শুধু অভিশাপ দিয়েছি এই নষ্টজন্মকে। তবুও ভুলতে পারিনি আমার আশা আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি একদিনের জন্যে হলেও ছবির কাছ থেকেই আমায় খুঁজে নিতে হবে। দীর্ঘ এই বোবা দহন আমাকে কি নিস্তার দিয়েছে কখনও! কাউকে বলতে পারিনি, কাউকে বোঝাতে পারিনি, অসহায়ের মত স্তব্ধ রাতে ক্যান্‌ভাসের সামনে বসে আপন মনে নিজস্ব ছাই দিয়ে ভরিয়েছি শূন্য আসন। পুনর্বার প্রতিটি সকালে জেগে উঠে প্রতীক্ষা করেছি— আজ বোধহয় আমার ছুটি হবে, আজ বোধহয় শমীক আসবে, আজ আমি আমার সেই স্টুডিওটায় গিয়ে ডুবে যেতে পারব নিজস্ব গহনে। বলতে পারো, এই আকাঙ্খাটাই প্রতিদিন বাঁচিয়ে তুলেছে ঘুমের অতল থেকে। আজ যদি পর্ণার মধ্যে দিয়ে আমার হারানো পূর্ণিমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, তার জন্যে আমি তো জীবনের কাছেই কৃতজ্ঞ। সব ছেড়ে বেড়িয়ে এসে পূর্ণিমাকে রক্ষণাবেক্ষনের যে দায় একদিন তীব্র হয়ে উঠেছিল, পর্ণার মধ্যে নিজেকে ফিরে পেয়ে আজতো ততটাই তীব্র হয়ে উঠছে জীবনকে ব্যক্ত করবার অপূর্ব বাসনা। মেয়েটিকে ততটাই প্রতিহত করতে চাইছি যাতে পূর্ণিমা ভাববার সুযোগ না পায় যে, তারই মেয়ের মধ্যে দিয়ে আমি চরিতার্থ করছি আমার এক অবদমিত প্রতিশোধ স্পৃহা। আর এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে বারবার মনে পড়ছে তোমার মুখ। সম্ভবতঃ তুমিই আমার সাম্প্রতিক এক এবং একমাত্র বন্ধু যার কাছে আমি কিছুটা নির্জন হতে পারি। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এটুকু আমার মনে হয়েছেই, সেদিন বাসস্ট্যান্ডের শেষ উচ্চারণটুকু তোমাকে বোধ হয় নির্বিবাদ হতে দেয়নি। হয়ত

একটা প্রশ্ন নিয়েই তোমাকে ফিরতে হয়েছিল ! পর্ণা পরে আমাকে শুধু এটুকুই বলেছে 'অঙ্কুরবাবু নির্বোধ নয়। আমাদের তিনজনকে বুঝতে ওনার সম্ভবত ভুল হয়নি। আমার দুর্বলতাগুলোও ওনাকে জানিয়ে ফেলেছি'। আর এই ইঙ্গিতটুকুই বাধ্য ক'রে তুলেছে আপনার কাছে আমাকে স্বীকারোক্তি দিতে।

যাই হোক, পর্ণা আপাতত প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিলজফি অনার্স নিয়ে ভর্তি হতে চাইছে। কিন্তু আমার কাছে ওকে যেমন রাখতে আমি চাইছিনা, ওর মা-ও বোধহয় সে অনুমতি ওকে দেবেনা। কলকাতায় থাকলে হয় ওকে হস্টেল কিম্বা মেসে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমার পৈতৃক বাড়ীটাও একার পক্ষে যথেষ্টই প্রশস্ত। যদি কলকাতায় আপনার কোন ঠিকানার প্রয়োজন হয় নিৰ্দ্বিধায় এখানেই নামিয়ে দিতে পারেন শিকড়। তবে একথাটাও বলে রাখি, এই আমন্ত্রণের মধ্যে কোথাও কোন দায় পরিশোধের সামান্যতম অহংকারটুকুও নেই। যেহেতু বাড়ীটি বড়, যেহেতু আপনি মানুষটি বন্ধু হবার যোগ্যতা রাখেন এবং যেহেতু আপনিও আমারই মত জীবনকে বুঝতে চাইছেন প্রতিনিয়ত নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে—মানুষ হিসেবে সাধারণ সহমর্মিতায় ঠিক সেকারণেই আপনার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে এগিয়ে দিতে চাইছি এই আবাসটিকে। প্রয়োজনমত এখানে সেপারেশনের ব্যবস্থাও আছে যাতে দুজন দুজনার কাছ থেকে সহজেই আড়াল হতে পারি। অন্তত এদিকে এলে বাড়ীটি একবার ঘুরে যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ধন্য হব এ-কথাটা ফাঁপিয়ে না-বললেও, অনেকটা নির্ভার হব এটুকু বলতেই পারি। পারলে পর্ণাকে চিঠি দেবেন। ভালবাসা, শুভেচ্ছায়—

বন্ধু প্রলয়।

ষোলো.

সত্য কথা স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যে অবশ্যই পৌরুষের হানি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং বলতেই হচ্ছে, চিঠিটির দীর্ঘ

অংশ ছাপিয়ে আমন্ত্রণের অংশটুকু আমার হাতে যেন গুপ্তধন পাওয়ার সামিল হয়ে এলো। মনে হল একটা মেঘ যেন কেটে গ্যাছে। এবার হয়ত শিল্পীর পাশে শিকড় গেড়ে নতুনরকম ক'রে আবার কিছুটা বাঁচার কথা ভাবা যাবে। অন্ততঃ কলকাতা যে আমাদের মত ছোট-খাটো লিখিয়েদের এবং অবশ্যই বঙ্গ-ভাষাভাষিদের কাছে একটি বাঁচার জায়গা সে বিষয়ে বিতর্ক তুললে বহুক্ষণ ধরে তর্ক চালিয়ে যেতে পারব। বেশ ফ্রেশ্ লাগছে। যেন পা রাখবার একটা ভূমি জুটে গেল এ যাত্রায়। বস্তুতঃ এই সুযোগ গ্রহণ করবার মধ্যে কোন হীনমন্যতা তেমন না-থাকাই উচিত। কারণ, প্রথমত যদি বাড়ীটির বিপুল পরিমাণ অংশ অব্যবহার্য পড়ে থাকে, তাকে ব্যবহার করাটা অবশ্যই উচিতের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এই পঞ্চাশোত্তীর্ণ শিল্পীকে সঙ্গ দেওয়াটাও একটা পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যম করেই দেখা যেতে পারে। তৃতীয়ত, কেউ কারো ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করব না—এমন ঘোষণা যখন উনি নিজে থেকেই করেছেন, তখন আমার দিক থেকে খুব একটা দ্বিধা থাকবার কথা নয়। চতুর্থত, পত্রিকার লেখা-লিখির পরেও যদি সৃজনশীল লেখার প্রবণতাকে প্রাধান্য দিতেই হয় তবে প্রলয়বাবুর বর্ণনা অনুযায়ী ঠিকানাটি যথেষ্টই সহায়ক হবে বলে ভাবা যেতে পারে। এবং চেষ্টা করতে হবে ন্যূনতম হলেও আমাদের মধ্যে 'ভাড়া' নামক একটি ব্যবধান তৈরী করতে। তাহলে আমার দিক থেকে অনেক স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করা যাবে ঐ আশ্রয়টিকে। অবশ্যই শেষের শর্তগুলো যদি উনি সহজে গ্রহণ করেন বা প্রশ্রয় দেন, তবেই। সম্ভবত ওনার মত বুদ্ধিমান মানুষ এই সাধারণ দ্বন্দ্বটিকে বুঝতে ভুল করবেন না।

আমন্ত্রণকে ঘিরে এই লম্বা ভাবনাচিন্তার অবকাশেই পর্ণার প্রসঙ্গটাও বুদবুদের মত ভেসে উঠল মস্তিষ্কে। এই দ্বিতীয়বার পর্ণাকে চিঠি লেখার প্রয়োজনটাও তীব্র হয়ে উঠল। কাগজ কলম নিয়ে বসতেই জটিল হয়ে উঠল সমস্যা। কিভাবে এবং কোথা থেকে শুরু করব এই লেখা! পর্ণা যেমন জয়ন্তী নয়, তেমনই সমবয়সী তরুণীদের থেকেও কখন যেন ওর পছন্দ অপছন্দ আকাঙ্খা আকাঙ্খা পূরণের

উপায়কে ঘিরে দ্বন্দ্ব ওকে আলাদা করে তুলেছে। খুব বেশী হাল্‌কা কিম্বা খুব বেশী ভারী কথা—দুটোই এখানে অচল। তবে শুরুটা কিভাবে হবে! সর্বোপরি, ওকে তো বলবার মত তেমন কথাও আমার গুছোনো নেই। কিন্তু লিখতে হবে। লেখাটা উচিতও। অন্ততঃ আমার চিঠি ওকে কিছুটা কন্‌সোলেট করতে পারে। পারিবারিক বৃত্তে বিচ্ছিন্ন এই মেয়েটির এখন যে একটা বন্ধুত্ব প্রয়োজন এটুকু বুঝতে পারছি। আর এই বুঝতে পারবার ফলেই আমার মধ্যে একটা দায়বোধ কাজ করতে শুরু করেছে। একেই বোধ হয় কমিট্‌মেন্ট বলে। যেখানে পৌঁছতে পারলে ও' ভালো থাকবে, সেদিক থেকে গ্রহণ যেমন প্রলয়বাবুর কথামত এখন সম্ভব নয় আবার সে যেখানে রয়েছে সেই পূর্ণিমাও এখন ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং এই বিচিত্র জটিলতার ফাঁসে সদ্যবিকশিত মেয়েটির মনটি যদি পিষ্ট হতে থাকে, কোথাও কিছু জড়িয়ে ওঠবার সুযোগ যদি সে না পায়, হয়ত ওর স্বতঃস্ফুর্ত ফুটে ওঠা ব্যাহত হতে হতে এক নিষ্ঠুর পাথরতা ওকে গ্রাস করতে পারে। কিম্বা এমনও হতে পারে, ভীষণ একগুঁয়েমিতে নিজেকে ধ্বংস ক'রে দেবার প্রবণতায় এমন কোন মাধ্যম সে অবলম্বন করে বসবে যাকে আশ্রয় করেই নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে পতিতাজন্ম। সুতরাং খুব মানবিক কারণে পর্ণার দিকে এই মুহূর্তে বন্ধুত্বের হাত এগিয়ে দেওয়া দরকার। বোধ-হয় এইসব বিবেচনাতেই সেদিনের বাসস্ট্যান্ডের শেষ সাক্ষাতের অনুরোধের মতই, প্রলয়বাবুর চিঠি আজকেও শেষ হয়েছে পর্ণাকে কিছু লিখবার আর্ত অনুরোধে। মেশামিশি অল্প হলেও ভদ্র-লোকের একটি পরিচয় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অপ্রয়োজ-নীয় কথা উনি বিশেষ বলেন না। এবং প্রতিটি উচ্চারণের পেছনেই একটি প্রচ্ছন্ন মনন থাকে। কিন্তু সে-সব বিবেচনাতেও নয়—আমার নিজেরই বোধ বলছে পর্ণাকে কিছু লেখা দরকার এবং সেটা এক্ষুণি। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে, চিঠিটি যদি পূর্ণিমা দেবীর হাতে গিয়ে পড়ে এবং তিনি যদি খুলে পড়েনও, তবু যেন কোন ভুল বোঝাবুঝির নতুন ক'রে সূত্রপাত না হয়।

মোটামুটি ঠিকই করে নিলাম প্রলয়বাবুর চিঠি পাইনি ধরে নিয়েই এবং পূর্বপরিচিতির সূত্র ধরেই ওকে কিছু লিখতে হবে। অবশেষে যা দাঁড়ালো সেটা এইরকম—

স্নেহের [illegible],

শেষ দেখা হওয়ার পর বেশ কিছু রাত্রি কাটিয়ে ওঠা গেল। বেশ কিছুটা বন্ধ হলাম। সময় ঝরিয়ে ঝরিয়েই আমাদের চেষ্টা, কাজ, বিনিয়োগ, অর্জন। তোমাদের বাড়ীতে যে রাত্রি সেদিন পেরিয়ে এলাম— মানুষের অনন্ত প্রযুক্তি ফেরাতে পারবেনা— সেই বিশেষ দিনাঙ্ক। বিশেষ মুহূর্ত। তবে শিল্পে নিশ্চয়ই তাকে পুনরায় অভিব্যক্ত করা যেতে পারে, তবুও সেটি শব। মুহূর্তের কফন্ ঘাড়ে স্মৃতিতে হেঁটে যাওয়া। বলতে পারো কল্পনায় দ্বিতীয় নির্মাণ এবং যে নির্মাণের কৃত্রিমতা কখনও আসল মুহূর্তটিকেও ছাপিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, কখনও আবার ফ্যাকাশেও হয়ে যায়। হয়ত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা তাকেই বলেছিলেন Imaginative reconstruction of life, কেউ আবার এভাবেও বলেছিলেন Imagination of imaginations, অর্থাৎ কল্পনার কাল্পনিক নির্মাণ। তোমাদের বাড়ীর সেই রাত্রি যদি আজ আবার ফেরাতে হয় তবে সেটা কেবল কল্পনার শক্তিতেই সম্ভব। এবং তাকেও নতুনভাবে কল্পনার মাধ্যমেই সৃজন করতে হবে শিল্পে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, শিল্পের বাস্তবতা কখনই এই মুহূর্তের বাস্তব রূপটিকে যথাযথ এবং সম্পূর্ণত প্রতিফলিত করতে পারেনা এবং করেওনা। চেষ্টার মাধ্যমে কেবল এক অর্ধবিকৃত নির্মিত হতে পারে। মুহূর্তকে রূপ দিতে গেলে মনে রাখতেই হয়, ঘটনা পরম্পরায় যতটুকু প্রকাশ করা গেছে সেটুকু সত্য। আবার, সেই মুহূর্তের মধ্যেই এমন অনেক কিছুই ছিল যা প্রকাশ হতে পারেনি কিন্তু হতে পারত। আর এই প্রকাশিত হতে না পারার পিছনে বস্তু এবং ব্যক্তির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গ্যাছে। সেই সীমাবদ্ধতা প্রথমত ভাষার, দ্বিতীয়ত সামাজিক শৃঙ্খলের। আর এই সামাজিক

শৃঙ্খল তৈরী হয় মানুষের দ্বারা আরোপিত কিছু বিধি নিষেধ, মূল্যবোধ, ইত্যাদির সমন্বয়ে। এই শৃঙ্খলাই আমাদের বাধ্য করে অবদমনের পথে যেতে। এছাড়াও বলাই যায়, ব্যক্তি মানুষের অহংকার অনেকাংশেই শাসন করে বা মুহূর্তের সম্ভাব্য প্রকাশের বুকে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে যায় ঔদ্ধত্যে। শিল্পী সেই অনালোকিত, অনুচ্চোকিত তীব্র বিকীরণকে আড়ালের গূঢ় ষড়যন্ত্র ছিঁড়ে, প্রকাশ করতে চায় নিজস্ব মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে স্বতন্ত্র দক্ষতায়। এবং এই দক্ষতার ডিগ্রী অনুযায়ী প্রকাশেরও তারতম্য ঘটে। আর সে-কারণেই কোন কোন শিল্প ধ্রুপদী মর্যাদা পেয়ে কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন শিল্প স্ব-সময়ের বুকেও তেমন কোন ঢেউ সঞ্চার করতে পারেনা। —এই দীর্ঘ ভাষণের জন্য আমায় ক্ষমা কোরো। বস্তুত বলতে চাইছিলাম আমাদের ভাবনারও অগোচরে জীবন থেকে পলে পলে যে বয়স ক্ষরিত হয়ে চলেছে সেই অনন্ত মুহূর্তের এক চলমান রূপ অবয়ব আমাদের এই শরীর। আর শরীর নামক এই মাটির গাড়ীটির প্রকৃত সারথী আমাদের চেতনা। সুতরাং সু-চেতনা যেমন আমাদের সৃষ্টির পথে, নির্মাণের পথে নিয়ে যায় তেমনই কু-চেতনা প্রতিনিয়তই আমাদের ধ্বংসে প্রলুব্ধ করে, প্রতিনিয়তই মিথ্যে অহংকারে আমাদের বাধ্য করে ক্রোধ ঈর্ষা ঘৃণা এবং হিংসার বাতাবরণ গড়ে তুলে নিজেকে এবং পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলতে। অসহায় ভাবে চেতনার এই দ্বৈত-প্রবাহে শৃঙ্খলিত আমাদের অস্তিত্ব। এ দাসত্ব থেকে মুক্তি একরকম প্রায় অসম্ভব। তবে মানুষ হিসেবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বই হচ্ছে সু-চেতনার চর্চায় কু-চেতনার প্রভাবকে পরাজিত করা, অবদমিত করা এবং প্রতিমুহূর্তের অধ্যবসায়ে সেই কু-টিকে সু তথা সুন্দরের আলোয় ফিরিয়ে আনা।

পর্ণা—এ-সব কথা তোমাকে বলবার অর্থই হচ্ছে, তোমাকে উদ্দেশ্য ক'রে নিজেই একবার সত্যের মুখোমুখি বসা। তোমার সামনে এখন যে পৃথিবী, সেখানে প্রকৃত মানুষের প্রয়োজন। তোমার বুদ্ধি,

তোমার বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং অন্যকে বোঝবার জন্য তোমার যে সহমর্মী মমত্বের পরিচয় আমি পেয়েছি— এটুকু বিশ্বাস সেই রাত্রেই তোমার প্রতি জন্মেছে, তুমি খুব সাধারণ নও। এবং কখনোই সাধারণের মত জীবনযাপন তুমি করতে পারবেনা। আর সেই জন্যেই জীবনের এক শুভ্র, এক সামগ্রিক মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই সামনের পথে তোমার পা বাড়ানো উচিত। অন্ততঃ সাধারণ কোন মঙ্গলবোধকে প্রতিটি মানুষেরই উচিত লালন ও পরিচর্যা করা। যে শুভবোধের মধ্যে দিয়েই মানুষ সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে গোপন অনুভূতিতে। যদি জিজ্ঞেস করো সেই মঙ্গলবোধের স্বরূপ কিরকম? তবে আমার মত করে আমি বলব — যেন কখনও ব্যক্তিগতভাবে আমি কারও ব্যথার কারণ না-হয়ে উঠি; যেন আমি সচেতনভাবে নিরপরাধ কাউকে আহত না-করে ফেলি এবং আমার দ্বারা অন্য কারও মঙ্গল না-হলেও কখনও যেন কারও খুব বড় একটা ক্ষতি না-হয়ে যায়।

আমায় ক্ষমা কোরো পর্ণা। নীতিশাস্ত্রের এই তাত্ত্বিক পরিচর্যায় যদি তুমি বিরক্ত হয়ে ওঠো তবুও এই ভেবে ক্ষমা কোরো যে, এই মুহূর্তে একজন মানুষ তোমার এক সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করেই এই কথাগুলো তোমার উদ্দেশ্যে গেঁথে তুলল। অন্ততঃ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর তুমি একজন প্রকৃত নারী হয়ে উঠবে — সেই কাঙ্খাতেই আপাতত থামছি। বড়দের শ্রদ্ধা জানিও, ভালো থেকো। ভালোবাসা — শুভেচ্ছায় —

অঙ্কুর।

পুনঃ আরও একটি কথা না লিখলে চিঠিটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জীবন মানেই শুধু নুইয়ে থাকা নয়। জীবন মানেই শুধু স্পর্ধাও নয়। দুটোরই সাযুজ্য প্রয়োজন এবং স্পর্ধিত বিনয় দেখাবার ক্ষমতাও অর্জন করতে হয়। এমন অনেক কিছুই জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায় কখনওই যাকে জয় করা যায়না। আবার এমন অনেক কিছুও রয়েছে, জয় করেও

যাকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে নিজস্ব অবস্থানে। আর এই ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ অবশ্যই পরাজয় নয়। বরং এই পৌরুষটাই অনেক বেশী কাঙ্খিত। নিজস্ব ভোগ করবার চাইতেও, অন্যাকে উপভোগ করবার সুযোগ দেওয়ার মধ্যে বোধহয় সার্থকতা অনেক বেশী !!

সতেরো.

পাতা ভ'রে ভ'রে প্রতিদিনই নানারকম কিছু লিখতেই হয়। বেশীর ভাগই রাজনৈতিক নেতাদের নিকৃষ্ট ধারাভাষ্যের খসড়া কিম্বা সুযোগ বুঝে তাদের উপর শব্দের দলা ছুঁড়ে মারা। সংবাদপত্রের কাজ সাম্প্রতিক কালে এমনই হয়ে উঠেছে। এটা ঠিক হচ্ছেনা, ওটা ভুল হল, তেমনটি করলে ভালো হত ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব লেখা-লিখিতে বিশেষ তেমন অসুবিধে হয়না। কারণ, দলাপাকানো যে অর্থনীতির পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নেতাগোত্রীয় মানুষদের প্রতিদিন সহস্র পরিকল্পনা, বিরাট বিরাট ভাষণ, অধিবেশন, প্রতিশ্রুতি প্রদান, আশ্বাস জাতীয় ব্যাপারগুলো করতেই হয়—সেগুলো বেশীরভাগই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের স্বার্থবিরোধী চমক হয়ে ওঠে। সুতরাং কাগজওয়ালাদের চুটিয়ে কলম বাগিয়ে হৈ হৈ ক'রে রণক্ষেত্রে নেমে পড়বার সুযোগও বিস্তর। কিন্তু অসুবিধেটা দাঁড়ায় তখনই, যখন ব্যক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আর কারও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বন্ধুত্ব সুলভ মনোভাব পোষণের প্রয়োজন হয়ে ওঠে জরুরী। এক্ষেত্রেও পর্ণার জন্য কিছু লিখতে গিয়ে যেন কালঘাম ছুটে গেল। চিঠি হল কিনা জানিনা, তবে নিজের মনন মানসিকতায় যে বেশ পরিমান মরচে ধরেছে - এ-টুকু বুঝতে ভুল হলনা। একটি বাক্যও সম্ভবত খুব সহজ হয়ে উঠল না। না-ওঠবার কারণটাও খুবেই স্পষ্ট। যেটা চিঠিতেও উল্লেখ করা হয়েছে একবার। বস্তুত আমি নিজেও যেন আরও একবার কবিতার মধ্যে দিয়েই জীবনকে দেখতে চাইছি, বুঝতে চাইছি। আর সেই তাড়নাটাই বোধহয় ভীতরে ভীতরে আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে।

স্বভাবতই, পর্ণাকে চিঠি লেখবার সুযোগে যেন নিজেকেই উদ্ধার করতে চাইছি হাজার ফুট পলির নীচ থেকে। তবে লেখাটি বার-দুয়েক পড়তে গিয়ে মনে হল, পর্ণা যদি লেখাটির কিছু অংশও স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে তবে ওর সামনের জীবন খুব বেশী তিক্ত হয়ে উঠবে না। কারণ, লেখাটির মধ্যে নতুন কথা বিশেষ কিছুই নেই। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নিজেকে সুন্দর করে তোলবার জন্য যে উপায়গুলো ভেবেছে, তারই এক সরলীকৃত ধারা বিবরণী বলা যেতে পারে সমগ্র চিঠিটিকে। সুতরাং কিছু শুভ চিন্তার প্রতিফলন রয়েছেই। এবং অগোচরে শিল্পীকে বোঝবার ও তার ঘাড়ে অপ্রয়োজনীয় দায় চাপিয়ে দেওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রয়েই গেছে চিঠিটিতে। বাকি যা কিছু — পর্ণা, পর্ণার মত করেই গ্রহণ করুক। এইসব ভাবতে ভাবতেই দ্রুতহাতে খামের মুখে আঠা লাগিয়ে ডাকবাক্সে তুলে দেওয়া হল ভাবনার সেই দলিল। আর আঙুল ছুঁয়ে এন্‌ভেলপ অন্ধকার আড়ালে মুখ লুকোতেই, মনে পড়ে গেল বেশকিছু আগে লেখা নিজেরই কবিতার কয়েকটি লাইন—

দরজা নেই, জানালা নেই
স্বচ্ছ একটা মেঝেও পাইনি আসন পাতার
কোথায় তোমায় জায়গা দেব, বরং থাকো
আল্‌পনাতে দাঁড়িয়ে থাকো অমোঘ দুপুর
একটা হৃদয় খুঁড়ে তুলেছি দুহাত ভ'রে
একটা নিখুঁত হলুদ পাতায় ভালোবাসায় রোদ এঁকেছি
ওইতো আসন, ওইতো মেঝে—
দরজা জানলা না-থাকে থাকুক
দুপুর আহা একলা দুপুর কঁকিয়ে উঠুক
নিজেকে ভাঙার, ভাঙতে ভাঙতে চূর্ণ হবার জীর্ণ হবার
হয়ত একটা অর্থ মিলবে — হয়ত আবার বলব জীবন
ভালই ছিল, ভালই ছিলে — !